মানুষের গুহ্যসঙ্গীত

অলকেশ ভট্টাচার্য

নীল-সরস্বতী প্রকাশন
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৭০০ ০০৯

প্রথম মুদ্রণ—জানুয়ারি, ১৯৬৪

গ্রন্থস্বত্ব ☐ অলকেশ ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ☐ তমাল ভট্টাচার্য

প্রকাশক ☐ বৈশম্পায়ন ঘোষাল
নীল-সরস্বতী প্রকাশন
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

২. জুমার জঙ্গলে বাতাস জোর বইলেই মোহনের ভয় লাগে। উত্তুরে বাতাস যে জুমার গাছপালা জোরে কথা কয় না। হাওয়ার বেগ আরো গতি পায়। ডাকাতের রণপার ওপর তখন ভর করে পবনদেব। কার কপাল ভাঙবে কে জানে। বাড়ীর সামনে একেণে নারকোল গাছটার তখন কি ফুর্তি, পারলে নাবোয় মাথা ঠেকিয়ে পেন্নাম হয়ে বলে 'রইলো ঠাকুরমশাই চাট্টি ফল রইলো'. সত্যি সত্যি যদি কোনদিন ওর ঠাকুরভক্তি সত্যিই হয়ে ওঠে তাহলে জাডালের ধার ঘেঁষে একটা ঘর ভাঙার শব্দ ছুটতে ছুটতে শ্মশানের দিকে উত্তরের মাঠ পার হবে। আর মোহনঠাকুরও কি বাদ যাবে, হুড়মুড় করে বেলের মতো মাথাটাকে বেলের মতোই ফাটিয়ে দেবে। বাহাত্তা কপালেই বুলিয়ে নেয় একবার। জুমার জঙ্গলের পাগোল বাতাসটা আর শব্দ করছে না। ওর নাচন থেমে যাচ্ছে। দোর ঘেঁষে উঁচু করলো চোখ, আকাশ ফরসা হচ্ছে, অন্তত হবারই লক্ষণ। নবের বউয়ের মতন নারকোল গাছটা লক্ষ্মী হয়ে যাচ্ছে শুধু পাতাগুলো নিজের জায়গায় কিছুতেই স্থির হতে পারছে না। মোহনঠাকুর একপা একপা হেঁটে বেয়ে উঠোনে নামে। সামনের বুড়োআঙুলের সঙ্গে আর তারপরে লগ্ন। চাঁড়স আঙুল কুঁচকে গোড়ালির ডানধারটায় মাটি চেপে ধরে মাঝখানে মাটির ওপর এক চিলতে সেতু তৈরী করে একপা একপা এগিয়ে দরজার খিলখুলে হাঁক পাড়ে, যতীন রই'। বিপরীত বাঁশঝাড়ের ওপার থেকে উত্তর এলো 'যাচ্চি গো ঠাকুর'। পুনর্বার হাঁকলো মোহন। পুনবার উত্তর দিল যতীন। যেমন ওয়ান-টু ওয়ান-টু করে মাটিতে নেমে ছিল ঠিক তেমন করেই পৈঠেতে পা দিয়ে উঠলো। ডানদিকের কুলুঙ্গীর নিচে ঠেস দিয়ে বসলো। দু'পায়ের গুঁপোগুলো বড্ড কষ্ট দিচ্ছে ক'মাস। কাটারি দিয়ে কেটেছেও কবার,

তবু শালার নাম নেই। সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে গ্যাল কিনা কে জানে! তাই হলে তো আর কদিন পর ও শালার ব্যাধি পেটে হাত চালাবে, পাড়ায় বেরোন বন্ধ হলে ডানহাতের কাজ কারবার যে সিকেয় তুলতে হবে। বাপ তো এই সুবিধেটুকুই শুধু দিয়ে গেছে। নইলে আর কি। বিঘে দেড়েক জমি, একটা বাগান আর তার ঠিক আদ্দেক ভাগীদার। সহোদর ভাই, কলকাতার বাবু—উনী দুমাস তিন মাস অন্তর আসবেন। হৈ হৈ করে গান গাইবেন—আর ধমক দেবেন। 'আমরা তো সবটা দাবী করি না, অদ্দেক, তো অদ্দেক ফসলই দে'।

২. দরজা ঠেলতেই পরপর গালাগালগুলো শুনলো যতীন। 'শালা হারামী খচ্চর এতক্ষণে সময় হ'ল'। স্বভাববশতঃ হাসলো, বারান্দায় উঠে কুলুঙ্গীর দিকে আসতে গেলেই মোহন খ্যাক্ খ্যাক্ করে—'ঠাকুরের থানে না গিললে হবে কেন? চ'শালা গোলঘরে'। বাছুরটাকে খুলে গরুর প্রায় কাছাকাছি বাঁধে যাতে গোরুর বোঁটায় তার মুখ না যায়। বোঁটা পাওয়ার জন্য বাছুরটা বৃথা ছটফট করে। গরুর মুতের ওপর বাছুরটা ক'বার পা দিতেই ছিটকে ওদের গায়ে, তাড়ির ভাঁড়ে। যতীনের মুখের রেখাগুলো একত্র হতেই হা হা করে মোহন রসিকতা করলো— 'বলে গোময় গোমুত্তুর পেটে গেলে পাপীর পাপ নষ্ট হয়ে যায় আর তোর—হুঃ'। যতীনের বলিরেখা অল্প অল্প করে মিলিয়ে যায়। কাপড়ের গিঁট থেকে চারটে নোংরা মিয়ানো ফুলুরি বার করে। মোহন কপ্ করে দুটো তুলে নিয়ে একবার সপাটে শব্দহীন হাসে। লম্বা সিড়িঙ্গে হাত দিয়ে তুলে নিলো তাড়ির কলসী। দু'হাতে অমৃত পানের ভঙ্গিমায় কোঁৎ কোঁৎ শব্দে আদ্ধেকটা গিলে খুশী মনে একটা ফুলুরী মুখে পুরে এক

পোঁচ মুছে নিল রুস। পিছনটা ভিজে ঠেকতেই মুখ ঘোরায়। গরুর মুতের বাঁকা রেখা ওর পশ্চাৎদেশ স্পর্শ করেছে, ভিজিয়ে দিয়েছে কাপড়। কথা না বলে সরে বসলো কোণ ঘেঁষে তারপর যতীনকে নিঃসাড়ে খেয়ে যেতে দেখে মুখের ওপর থেকে ভাঁড়টা কেড়ে নিয়ে অবশিষ্টাংশ নিজের মুখে ঢালতে ঢালতে যখন শেষ হয়ে যায় তখন আলতো টেঁকুর তুলে বাকী ফুলুরিটা কপ্‌ কপ্‌ শব্দে চিবোতে চিবোতে বললো—'আজ হাটবার'। যতীন মুখ মুচকে মুচকে হাসছিল, ওর খাওয়ার ভঙ্গী দেখছিলো নির্ভেজাল মাতালের মতো। একটু একটু করে দুলতে লাগল যতীন, নেশা এলে ওর দোলন পায়, উবু হয়ে বসে দুটো পায়ের ওপর দিয়ে সারা শরীরটা দোলাতে দোলাতে বলে - 'তাইলে লাউদুটো পেড়ে দি'। 'শুধু লাউ'!— —'নইলে দুটো পুঁই কেটে দি'! 'আর কিছু নয়'?—'আবার কি? বাতাবিকটায় তো এখনও রং আসেনি'। মোহন দু সেকেণ্ড চুপ থেকে বলে—'তাই কর'।

৩. চারটে মাঝারি সাইজের লাউ, গোটা কুড়ি কাটা পুঁইয়ের ডগা। ধামায়। মাথায় লাগছে। লাগছে পায়ে। ফুটো হয়ে গ্যাছে ন্যাকড়ার জুতো। ও বছরে পুজোর 'পর কিনে দিয়েছিল ছোটভাই। কলকাতায় থাকে—এসে বললে—'এ কেডস্‌ পরলে তোর পায়ে লাগবে না'। তা প্রথম বাপু আরামই দিত, তারপর স্বমূর্তি নিতেই গুঁপোর গজাল মাথা পর্যন্ত খাওয়া করে। বুড়ো আঙুলের তলা গোড়ালির তলা হাঁ হাঁ কচ্ছে। ওপরে রবার থেকে ন্যাকড়াটা দু আঙুলের মতো সরে গ্যাছে। তা তো যাবেই—ওর আর দোষ কী। গায়ের জামাটাও ওরই দেয়া। খাকী জামা। জামায় পকেট। পকেটে ঢাকনা। কাঁধে একটুকরো কাপড় এসে

কলারের পাশে বোতামের ঘরে বন্ধ হয়ে আছে। হাঁটু বরাবর লম্বা। একটু লম্বা জামাই পছন্দ করে মোহন, শীতকালটাও কেটে যায়। শুধু কাপড়টায় একটু গোলমাল। পাছাটা এমন ছিঁড়েছে। আর একটা অবিশ্যি আছে, সেটা পূজোর জন্যে। ফর্সা কাপড, ফর্সা পৈতে, ফর্সা রং—তখন মোহনের নিজেকে বড় ভালো লাগে। একটু সোজা হয়ে চলার চেষ্টা করে, বেশিক্ষণ পারে না। পিঠে ব্যথা হয়। 'বেলমাতা'—হারামীর বাচ্ছারা—পোঁদে লাগলো এবার। কথা বলতে ইচ্ছে হোল না। আবার 'বেলমাতা'। 'তোদের বাপের মাথাটা বেলমাতারে শালা, খচ্চর'। নাতির বইসী ছোঁড়াগুলো ওকে একবার পেলে হয়। কি যে চাপে তখন। কেন অন্য পোঁদে লাগ না। শালাদের যত ভাবে কিছ বলবে না, রা কাড়বে না, তো শোনে আঁটকুড়োরা। শুয়োরের পালের মত, জোঁকের মত লেগে থাকবে। —'বেলমাতা'। গাটা চিড়বিড় করে ওঠে। মনে হয় পেটে মারি একটা কাঁৎ করে, দাঁত কেলিয়ে পড়ে থাকুক, মনে হয় গলায় পা দিয়ে দাঁড়াই একবার, দু হাত জিব বেরিয়ে যাক্। 'বেলমাতা'। 'তবে রে হারামীর—' ধামাটা নীচে রেখে তোলে একটা মাটির চাঙড়। 'মরশালারা'—একটু দূরে পড়ে চুরমার হল, একটুকরো বোধহয় আদকদের ছাগলটাকে লাগলো, প্যাঁ—এ্যাঁ—এ্যাঁ শব্দটা একটু তীব্র হতেই আবার ধামাটা মাথায় তুলে ওয়ান টু ওয়ান টু করে বেঁকে গ্যালো দাশেদের ক্ষেত। উচ্ছের। লোভ লাগলো। উচ্ছেগুলো ডাগর ডোগর হয়েছে। কটা তুলতে পারলে মন্দ হয় না। উপরী উপায়। রাস্তা ধরে যেতে যেতে পটপট করে তুলে নিল কটা। —'কি গো ঠাকুর—এটা কি কোচ্ছ—' চমকে পিছনে ঘোরে। 'এই যে খুড়ো গোটা দুত্তিন তুলে নিনু, বড় তেঁতো খেতে ইচ্ছে যায়'। সোনা

পাকরে দুবার কেঁশে নিয়ে বলে 'তা তোমার হলে পাত্তে, কচি ফল কি তুললে চলে ঠাকুর'? 'তা যা বলেচ, তবে কি না,—বুইলে খুড়ো—লোভের বশে—নইলে কি আর'—প্রসঙ্গ পালটায় মোহন—'কি নিলে'? —বেগুন চাট্টি'। সোনা পাকরে ওকে ফেলে এগিয়ে যায়। একটু লজ্জা লজ্জা করছে মোহনের। হাজার হোক চুরি বই কি। আগে হলে চোখ জ্বালা জ্বালা করতো। এখন আর করে না, পেট যে কী চিজ। কুড়ি মিনিটের পথ মোহনের চল্লিশ মিনিট লাগে। ব্যাপারীর হাতে লাউ, শাক আর উচ্ছে তুলে দিয়ে সাঁতরাদের দোকানে ঢোকে। বসন্ত চক্কোত্তিকে দেখে উঠে গিয়ে ওর পাশে বসলো। 'বল খবর কি, ভাই কবে আসছে'? —'কি জানি, ওরা হোল কোলকাতার লোক, ওদের কী আর মন টানে ভাই, গেরাম ভাল লাগবে ক্যানো'! 'কেন গেল মাসে তো এসেছেন,'—'তা বটে, তবে আসতে চায় না ভাই, নইলে কী আর আমার এ দশা হয়'। চক্কোত্তি বোঝে এরপর মোহন চা খাওয়াতে বলবে, হঠাৎ উঠে দাঁড়াতেই মোহন কোপ মারে 'একপাত্তর খাওয়াবে না?' চক্কোত্তি সাঁতরার বয়টাকে পনেরটা পয়সা দিয়ে বলে যায় এক কাপ চা দিতে। মোহন ঘাপটি মেরে তাকিয়ে ছাখে ব্যাপারটা কেউ বুঝলো কিনা।

৪. আজতো অনেকক্ষণ ভিজলো তো নরম হোল না কেন? আবার ভিজুতে ইচ্ছে করে না, পেটে খয়রাশোল ঘাই মারছে। চার আনার বোঁদে এনেছে। ফি সপ্তা হাটে গেলেই বোঁদে আনে, বোঁদে ভালবাসে মোহন। আজ কিছুটা খেয়ে আদ্দেকটা রেখে দেবে কাল সকালের জন্য। দশ নয়ার মুড়ি আর বোঁদে। ভাবতেই ভালো লাগে।

কেমন একটা আঠালো চটচটে লোভের হাত মুঠো হয়ে মুখের আগায় এগিয়ে আসে। মুখে রস এসে পড়ায় ফোকরের ভেতরে ঢুকিয়ে নিলো। আস্তে আস্তে থালায় হাত চেপে জল ফেলে। ছর ছর করে শব্দ হচ্ছে। ছর ছর করে—হাসি পেলো ওর। একটু হেসেও ফ্যালে। সব জলটা পড়ে যেতে একমুঠো চাল মুখে তুলে আবার বুঝলো আরো খানিকটা শোষ করালে হোত। বেশ শক্ত লাগছে দাঁতে। কষ্ট হচ্ছে। হোকগে। রান্নার চেয়ে অনেক ভালো। ভাঙা উনুন, কাঠের দরকার, এক ছিলিম কেরোসিন, তার হাঁড়ি, কড়া ঝামেলা অনেক। তার চে এ অনেক ভাল—দু মুঠো ভিজে চাল, সঙ্গে, চাট্টি করে বেঁদে। তারপর ঘটিটাক জল। আহা মধু মধু। লম্ফটাতেও তেল নেই. আস্তে আস্তে কমে আসছে। সন্তের নয়ার তেল। কতক্ষণ। খাওয়ার পর থালাটা ধুয়ে তারও পর বাকী বেঁদেটা রেখে চুপড়ি চাপালো। কাল হবে। সকাল দশটা এগারোটা নাগাদ খেলে দুপুরটা মেরে দেয়া যায়। মোহনের এরকম প্রায়ই হয়। তেল থাকতে থাকতে মশারীটা খাটিয়ে দরজা বন্ধ করে। অল্প অল্প আলোয় ঘরময় নানা ছায়া দেখতে লাগে। একসময় কোন ছায়াই দেখা গ্যালো না। চোখদুটোয় যতটা পারে ততটাই দৃষ্টি দিয়েও কিচ্ছু দেখতে পায় না। মশারিটা শতচ্ছিন্ন হয়ে গ্যাছে। একটা কেনা দরকার। কেনা বটে। চেয়ে নেবেখ'ন কারো কাছে। গোপালকেই বললে হয়। পুরোন—ছেঁড়াটা থাকলে কী আর ও দেবে না? তা দেয়, দেবে। মশারির ভেতর দিয়ে যে দৃষ্টিটা দেখার জন্য হাঁকপাক করছিলো—এখন চালের বাঁ'খারের ক্ষয়ে যাওয়া টিনের ফুটো দিয়ে সেটা তারা দেখতে পাচ্ছে, গোটা দুয়েক। তারা দেখতে ওর ভালো লাগে। বেশ লাগে, টিনের ছাউনী। টানা চারটে ঘর।

চারটেই টিনের চাল। বড়দা বেঁচে থাকতে খোলার চাল বদলে টিনের করেছিল, তার আর বদল নেই। দাদার ঘরটায় যদি এক্ষুনি বদলাতে পারতো—তো ঘরটা জলের হাত থেকে বাঁচতো, মোহনের ঘরের বাঁ পাশের দুটো ঘরে অবিশ্যি চাউনীর কিছুই হয়নি। ভাইয়েরা এলে থাকে, শোয়। অন্য সময় বন্ধই থাকে। মাঝে মধ্যে ধান উঠলে দু' একবার খোলাটোলা হয়। ঘরের পেছনদিকে বাঁশঝাড় থেকে একটা ডগা এসে পড়ছে চালে। খড় খড় সড় সড় শব্দে ঘুম আসে না। কালকেই যতেকে দিয়ে কাটাতে হবে। এত বড়ো তক্তোপোষে মোহনের শুতে ভালো লাগে না। প্রথম প্রথম সত্যিই শুতে পারতো না। নিরাভরণ, আলগা মনে হোত। পিঠে লেপের দলা-তুলো ঠেকলে কাঠ মনে হোত। আজকাল আর লাগে না, শুধু হঠাৎ করে কেমন যেন মন খারাপ হয়ে যায়। রোজ অন্ধকারে চেয়ে থাকতে থাকতে চালের গোলমতটার ফাঁক ফোঁকরে দু একটা তারা চোখে ভাসতে ভাসতে ঘুম এসে যায় রেলগাড়ীর মতো। সাবিত্রী চলে যাওয়ার পর থেকেই এই দৃষ্টিহীন নিষ্করুণ চেয়ে থাকার নেশা তাকে পেয়ে বসেছে। এখন বড়ো সড়ো শেকড়ও চালিয়ে দিয়েছে ভেতরে।

৫. ফর্সা কাপড়, ফর্সা পৈতে, ফর্সা রং, গলায় উড়ুনি, পায়ে কেডস্ হাতে ঘটি, ঠাকুরমশাই চললেন পাড়ায়। যজমানি রাখতে। পূজো করতে কোনদিন বলে না মোহন। পূজোটা পরের, প্রথমে যজমানের মন। ঠাকুরের সামনে বেশীক্ষণ না বিড়বিড় করলে ওনাদের মন ভরে না। অথচ—হাসে মোহন। গম্ভীর হয়ে একই মন্ত্র আঠারোবার বিজবিজ করে যায়, বাড়ীর গিন্নী থেকে নাতনী শুদ্ধু গলায়

কাপড় ফেলে আভূমি পেন্নাম ঠেংকে। পেন্নাম করে ওঠার সময় মোহনের চোখও গোঁৎ খায়, ঠাণ্ডা পাথরের মতো চেয়ে থাকে, মুখ দ্যাখে, মুখ দেখে মন বোঝে। ভক্তির হদ্দ। সে মুখই আলাদা। সুখ—পূজোয় নয়। উড়ুনিতে। উড়ুনি ভরিয়ে চাল পায়। আর অন্য মুখগুলো, প্রায়ই যা দেখতে হয় মোহনকে। সে মুখ দেখলেই পেটটা গুলিয়ে ওঠে। চোখে জ্বালা হয়। দুটো মনসার ডাল, একটা পাথরের ঢিবি তখন মোহনকে লজ্জা দ্যায়। দ্যাখো দিখি ঠাকুরের নাম করে কী সবই না ভাবছে। নিকোতে নিকোতে কিংবা গোবর ল্যাপাতে ল্যাপাতে, অথবা গোল কাড়তে কাড়তে ছুটে আসে চাষী গিন্নী, তরতরিয়ে পেন্নাম করেই ছোটে। যেন তামাকে মুখ দিতে ভুলে গেসনু সময় পেয়ে একতুড়ি আর কি! গেল যা। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে এগোয় মোহন। দাশপুকুরের পশ্চিম কোণ বরাবর খোলাম ওঠা পাতর বাড়ির পেছন রাস্তা ধরে হাঁটতে গেলেই চোখে জল আসে। পা-টাকে যে খাবলে খাবলে খেতে চায়! চামড়া ফুঁড়ে তেড়ে যায় খোলামকুচি, সঙ্গে সঙ্গে পায়ের আঙুল আর গোড়ালি কুঁচকে ওঠে। মাঝখানে একচিলতে সেতু। জুতোর মধ্যিখানে শব্দ হয় থপ্ থপ্। একবার বাঁ ধারে আর একবার ডাঁ ধারে দুলতে দুলতে লম্বা শিড়িঙ্গে মানুষটা পিঠের ওপর থেকে একটু ভেঙ্গে ন্যায়—যাওয়ার গতি একটু বাড়ে—এরকম করে হাঁটতে হাঁটতেই ও একদিন খুব তাড়াতাড়ি যতীনের আগে বুড়ো হয়ে যাবে। বুড়ো হয়ে যাবার দুঃখ অবশ্য পীড়া দ্যায় না মোহনকে, পীড়া দ্যায় সংসার চলবে কি করে, পাড়া আছে না? বেরুতে তো হবেই। পৌঁছে যায় ঘোষবাড়ি। ঘোষবাড়ি ওর পুরোন যজমান। ওর বাপের আমল থেকে। বাড়ীতে ঢুকেই হাঁক দ্যায়—কই গো, এসো দিকিনি

বাপু একটু জলদি করে'। তারা ঘোষের বৌ ঠোঁটের ওপর পর্যন্ত কাপড় টাঙিয়ে এসে দাঁড়াল। কয়েক পল দাঁড়িয়েই থাকে। ততক্ষণ বসে পড়েছে ঠাকুর তলায়। ঘটি থেকে জল তরতড়া দিতে দিতে বলে --'গঙ্গাজল না ছিটোলে কিছুই শুদ্ধ হয় না বৌমা, অনেকে এসব করে না বটে, তবে কি না নিজের ধম্ম নিজের কাছে, নইলে ঠাকুর কি তোমায় মুখ ফুটে বলবে কোনদিন'? মেয়েলী নাকী শব্দ শুনে ঘাড় উঁচু করলো মোহন---'কই গো রেকাবি কয়'? চোখ ফেরালো। বৌটা কাঁদছে নাকি। হ্যাঁ, কাঁদছেই বটে। মুখে কাপড়ের আঁচল চলে গ্যাছে, দেয়ালটায় ঠেস দিয়ে শুধু ফুলছে---সারা দেহটা ছলছে। এরকম তো হয়নি কোনদিন। হোলটা কি? 'কি হোল বৌমা'? ঘোষগিন্নি যা জানালো তা মোহনের কাছে সুখকর নয়। কোলের ছেলেটাকে ছেলেপোঁতায় পুঁততে গ্যাছে তারা ঘোষ, মরেছে আজ ভোর রাত্তিরে। মোহন গুম হয়ে যায়। এরপর হরেন ঘোষের বাড়ী। না জানি সেখানেও কী অপেক্ষা করছে তার জন্যে। চাষী বাড়ী, ধান চাল আছে। আনাজ পাতিও আছে। তিনগণ্ডা গাই। হরেন ঘোষ পাড়ায় একটু মাতব্বর মানুষ। শুধু ধম্মে মতি কম। ঠাকুর মশাইকে কিছু দিতে থুতে গেলেই হাতে কুট হয়। না, রোজ যা পায় তার চে কমও নয়, বেশিও নয়। রেকাবির আদ্দেক চাল, চারটে আলু, একটা বেগুন, ছটো বাতাসা আর পাঁচটা নয়া। বাতাসা ছটো পেসাদ হিসেবে বাড়ীতে ফেরৎ যায়, অন্যসব ঠাকুরমশায়ের। ঠাকুর মশায়ের এ বেলাটা নিশ্চিন্দি। এবার পাড়ুইবাড়ি, এদের হাত আছে। এটা ওটা সেটা মাসে মাসেই জোটে। মনি পাড়ুই-এর পেটে বিদ্যেও আছে। সকালের ট্রেনে কলকাতা যায় রাত্তিরে ফেরে, ডেলিপ্যাসেঞ্জার। সবসময় সিগ্রেট খায়, গেল রোববার মোহনকেও একটা

দিয়েছিল। ও আর একটা চেয়েছিল। তাও দিয়েছিল। পূজোয় বসতেই মনির মেয়েটা এসে বসে গ্যালো 'ঠাকুরমশাই পূজো হলে মায়ের সঙ্গে একটু দ্যাখা করে যেও'। মোহন ঘাড় নাড়ে। আজ সে কালো পাথরটাকে ধুয়ে নিলো। চন্দন ঘষে দুটো ফোঁটা দিল। একটা ফোঁটা নিজে পরলো। সাজি থেকে ফুল আর বেলপাতায় চন্দন মাখিয়ে মনসা গাছে আর শিবের মাথায় লেপটে দিল। তারপর চাল-কলা-আলু-পয়সা উড়নীতে বাঁধতে বাঁধতে হাঁকলো 'কি গো মা দরকারটা কি'। ঘোমটা মাথায় একবাটি তরকারি আর দুটো ভাজা মাছ তুলে দিল মনির বৌ। 'মঙ্গল হোক মা. ধনে পুত্রে সুখী হও' একটা বাণী দিতে দিতে মোহনের মুখ রসালো হয়ে উঠলো। কতদিন পর আজ মাছ আর তরকারি ওর মুখে উঠবে তা মনে করতে পারে না। রাঁধতে সে পারে। কিন্তু জ্বালানি। ভাতের পর তরকারি তারও যেমন ঝক্কি, আবার সময় নিয়ে রান্না করবার রসদই বা কই? যখন ও রাঁধে তখনই তো কিছু কুড়োতে হয়, কিছু ভাঙতে হয়। সুখে ভাত খাওয়া তো ঘুচে গেছে এগারো বছর আগে। সাবিত্রী এগার বছর আগে চলে গ্যাছে।

·

৭. কিশোরী কোদালের মাচান থেকে কিছু প্যাকাটি খুলে নিয়েছিলো। তাতে ভাতটা হয়ে গ্যাছে। আজকাল আর হাড়ি থেকে থালায় তোলে না। মাজার ঝামেলা আছে। আজ একটু নুন চাই। হাঁক পাড়লো '—বাসন্তী রই'। বিশে ছুটে এলো—'দিদি ইস্কুলে'। মুখটা যথাসম্ভব মিষ্টি করে বললো—'যা না বাবা তোর মায়ের কাছে একটু নুন আর দুটো কাচালংকা চেয়ে আন'। তরকারির বাটিটা নাকের কাছে তুলে গন্ধ শোঁকে ঘি আছে মনে হচ্ছে, কপি, আলু, বরবটি, জিভে জল চলে আসছে। হাঁড়ির

ভেতর মাছদুটোর একটু করে কোণ ভেঙে খেল। আঃ কি স্বাদ গো। উঁকি দিয়ে ভাতের পরিমাণটা দ্যাখে মোহন। 'কোতায় নেবে?'—'রাখ্। কোথায় রাখবি'! ওগুলো রেখে, দরজার ঠিক বাইরে এসেই বিশে চাঁচালো—'বেলমাতা—বেলমাতা'। মোহন শুনেও শুনলো না। খেয়েদেয়ে বাটিটা হাড়ির ভেতর রেখে দু' ঘটি জল ঢালে। এবার একটা বিড়ি চাই। ভাঙা শুটকেশটার ভেতরে বিড়ি। টিনের, রংচটা, মরচে পড়েছে। শুটকেশটা বিয়ের। তা প্রায় একুশ বছর হোল। বিড়িটা বার করতে গিয়ে চোখ পড়ে—একজোড়া আঙট, দুটো মাথার কাঁটা, আর একটা তেলচিটে দস্তুর মতো ময়লাধরা ছেঁড়া ছেঁড়া চুল বাঁধা দড়ি। দড়িটা নাকে ধরলো। আরশোলার গুয়ের গন্ধ। তবু আছে, এগুলো সাবিত্রীর। কেন যে এগুলো রয়ে গ্যাছে থেকে গ্যাছে তা জানে না। আর আছে যখন থাকই না। বিছানায় ওঠে। বাঁ হাতটা মাথায় চেপে একটু কাৎ হয়। যতীন একদিন এগুলো দেখে ফেলে আক্ষেপ করেছিল—'ঠাকুর, ঐ কতায় বলে না—

পর্বত প্রমাণ যদি গৃহে ধন রহে।
অপুত্রীর মৃত্যুকালে রাজা সব লহে॥
কানা খোড়া হইয়া যদি পুত্র থাকে ঘরে
মৃত্যুকালে অবহেলে পিণ্ড দান করে॥

মরাপুত্তুরটা ছাড়া আর একটাও তুমি তাকে দিতে পারলে না, ঐ দেহ, ঐ স্বাস্থ্য ও কি আর সোয়ামীর ঘরে থাকে গা—এর থেকে ঝি গিরি করাও ভাল গো ঠাকুর'। তখন এক দৃষ্টে যতীনের লোভী চোখ দুটোর ওপর মাকড়সার মতন দেখছিল মোহন। সাবিত্রীর কথা উঠলেই শালা ঠারে ঠোরে ওর শরীরের কথা তুলবেই। কিন্তু সাবিত্রী তো সেজন্য যায়নি—কী আকালই গিললো সেবার। শুকনোর তিনদিনের দিন। মান-অপমান

খুয়ে ফেলে গরমেন্টের লোঙরখানার মাটলোর খিচুড়ি নিয়ে চুপ চুপ বাড়ী ঢুকেছিল মোহন। এ অপমান যে কেন মাথায় তুলে নিলো সে কথা এক বারও ভাবেনি সাবিত্রী। মুখে কাটেনি এক দানা। সন্ধ্যের ট্রেনে সেই যে বাপের বাড়ী গ্যাল—তো গ্যাল। অগস্ত্য গ্যাল, আর ফিরলো না। বহুকাল পরে খবর পেয়েছে লিলুয়ায় একটা সেলাইয়ের দোকানে মেশিন চালায়। সুখেই আছে।

৮. 'ঠাকুর ও ঠাকুর, ঠাকুর—' দমাদম দরজায় ঘা পড়ে। খি চিয়ে ওঠে মোহন 'কি রে শালা'—'তা বই কি—ওঠো দিকিনি, জরুলি খবর আছে'। কপাট খোলে ঘরের। পাতলা চোখ করে তাকায় যতীনের দিকে —'রাস্তা হবে, মাটি কাটবে, ইট তৈরী হবে, —পাকা পাকা রাস্তা গো'। —'তা, তোর বাপের কি রে শালা, এইজন্যি এত তাড়াদে' ঘুম ভাঙালি, বাঞ্চোৎ'।—'নাগো ঠাকুর গরমেন্টের নুটিশ এয়েছে, নতুন করে জমি নিচ্চে খবর পেনু'।—'কার কার নেবে'! 'অনেকের, গোপালদের, অনিলের, চিন্তা বামুনের, মহাদেবদের, আমার নকাটা, কিন্তুক—' গলায় টিল পড়লো যতীনের, ঢোক গিলে আস্তে আস্তে বললো 'তোমার দেড়বিঘেটাও'। শরীরের ভেতর ঝমঝম করে বাজনা বেজে ওঠে, শক্ত শক্ত কাঠপানা শরীরটা কড়মড় করে ওঠে, হাতের শিরাগুলো মনে হয় ফেটে বেরুবে, কপালে পরপর ভাঁজ তৈরী হয়, বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটা দিয়ে দোরের মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে জিজ্ঞেস করে—'কার কাছ থেকে শুনলি'। 'মদনদার থেনে। মদন দাস'। কেড্‌স জোড়া পরেই বলে—'চ'। 'ঘরে চাবিটা দাও'। 'আর চাবি দেয়া, শেকলটা দিয়ে দে'। একটু জোরেই হাঁটে মোহন। মাথায় অল্পচুল, খুব পাৎলা, সেই পাৎলা চুলগুলোই বিপরীত হাওয়ায় তির-

তির কাঁপছে। মুখের বলীরেখা বারবার পাল্টাচ্ছে। নাটচাতালে গজল্লা হচ্ছে। ভীড় থেকে একজন বলে—'ঐ বেলমাতা আসছে, ওর তো সবটাই পড়েছে'। মোহন কারো দিকে না তাকিয়ে কস মুছে মদনকে শুধোয়—'হ্যারে মদন, কি শুনচি'। —'হ্যা মোহন দা, ঠিকই শুনেচ'। এইবার নাটচাতালে বসে পড়ে মোহন। লম্বা লম্বা দেবদারুপাতার মতো শুকনো আঙুলক'টা চেপে ধরে মদনের হাত—'মদন, মরে যাবো মাইরী, এই, এইটুকুনই আচে, আর তো সবই গ্যাচে, জানিস তো,—শালার গরমেন্টের কাচে আমিই কি শুধু দাগী হয়ে আচি রা, হাসপাতাল হোল, আমার পাঁচ বিঘে জমি নিল, নাবি জমি, শালা ফসল উঠতো সোনা, সে সব গ্যালো, শিবরাত্তিরের সলতের মতো জলছিল এটা,—এটাতেও চোখ পড়েছে, শালা এটাও চাই, কেন কী এমন দোষ করিচি বাবা, একটা বিহিত কর মদন, তোর পা ধরে বলছি, বামুনের ছেলে, পৈতে ছুঁয়ে বলচি মদন আমি বাঁচবো না, বাঁচবো না' মদন ব্যস্ত হয়ে ওর হাত আটকায়। 'কিছু একটা হবেই মোহনদা তুমি ভেবুনি, আমরা এমনি ছাড়বো না'। মোহন উঠে দাঁড়ায়। ওর পা দুটো এলোমেলো। চোখে জল আর বেরোয় না। চোখ বুজে টের পায় কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, অল্প অল্প জল নিশ্চয়ই চুঁইয়ে চুঁইয়ে আসছে। হাত দিয়ে দ্যাখে মোহন। না, জল নয়, ঘাম। মদনের ওপর কোন ভরসা করে না মোহন। মদন তাকে বারো বছর আগে আরো একবার ভরসা দিয়েছিলো, কদিন একসঙ্গে ভিড় করে চেঁচাতে চেঁচাতে বিডিও আপিসে গ্যাচে আর এসেছে। এসেচে আর গ্যাচে। কিছু হয়নি। অনেক ভালো কথা শুনিয়েছিল আপিসার। তারা শুধু কথা বলে। ভাইকে ডাকিয়েছিল কলকাতা থেকে। ভাই হেসে বলেছিল, 'মন্দ কি, কমপেনশন্ তো দিচ্ছে—টাকা নিয়ে আধাআধি করে নে। চাষ করা তো ঝামেলার বলিস'। ওর আর কি। ঝামেলা তো আছেই,

ঝামেলা না কল্লে কেষ্ট মিলবে কেন ? একগাদা টাকা হঠাৎ পেয়ে যাবে। ভাই আর এগোয় নি। মোহনের ছোটাছুটি বিফলে গ্যাছে। হাসপাতাল হয়েছে। লম্বা হলদে টানা বাড়ি। পেছনে সারি সারি ডাক্তার নার্সদের থাকার ঘর—আরো পেছনে পাইখানা। মোহনের হাসি পেত, বলে মানুষ থাকায় ঘর পায় না তো শালাদের হাগার জন্যি ঘর। কোনদিন, একদিনের তরেও হাসপাতালে যায়নি মোহন। জ্বরে হুহু করেছে, না হাসপাতালে নয়। গ্রামের গোপালডাক্তারই ভালো। তবু বিনি পয়সার ওষুধ নিতে নিজের চিতার ওপর কখনো ওঠেনি। আরও অনেকের সঙ্গে মোহনেরও নাবি জমির ওপর হাসপাতাল হয়েছে। কিছু করতেও পারেনি। আজ আবার গরমেন্টের আর একটা থাবা এগিয়ে আসছে। রাস্তা, ইট তৈরী। তা ভাল। জমিটা বাদ দিয়ে হয় না। এ নিয়ে কি একবার প্রধানের সঙ্গে কথা বলবে ? কিছু করলেও তো করতে পারে। সুয্যু ঢল ঢল। একপা একপা করে ও দেড় বিঘের দিকে এগোল। ভগবানের মার, তুনিয়ার বার। কে জানে কপালে কী আচে ! জমির আলে গে' দাঁড়ালো। বাবার মতো তু'চোখ দিয়ে ও সারা জমিটায় আদর ছড়ায় ! কে বাঁচাবে বল দিকি ওদের কবল থেকে। আমি কি আর পারবো। আচ্ছা এমনও তো হতে পারে গরমেন্টের এ জমিটা পছন্দ হোল না, গরমেন্টের তো কতো কী পছন্দ হয়েও হয় না। যতীন বলেছিল নুটিশ এয়েছে। তা কয়, নুটিশ এলে তো তাকেও সই করতে হোত। এমনও তো হতে পারে এটা হাওয়া। মদন দাস ভুল শুনেচে। মদন দাস যে সব ঠিক শুনবে তারই বা ঠিক কী। কাত্তিকশাল। আর তো কদিন পরেই কাটতে হবে। আলে বসে মোহন। তুটো শীষ নিয়ে মুখে, গালে, বুকে, গলায় বুলিয়ে ছ্যায়। বগলে লাগতেই কিরকির লাগে। হেসে

ফ্যালে। পা-পা-করে মাঠটার চৌদিকে একবার ঘুরে ন্যায়। বুকের ভেতরটা হাঁ হাঁ করে ওঠে—আসছে বছর কী সত্যি সত্যি এমন ধান দেখবে মোহন!

২. আজ আর ঘুম নাবে না। ক-বছর ধরে এটাও আর সুখে হয় না। জেগে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে। নোংরা মশারির গন্ধ আর ফুটো দিয়ে মশার আগমন রুখতে ভাঙা হাতপাখা চলে। আর অন্ধকারের গর্তের ভেতর আকুলি-বিকুলি করে মোহন। তবু এক চিলতে ভাললাগা আছে এ ঘরটায়, ভুল করে মাঝে মধ্যে সাবিত্রির ভেজা চুলের গন্ধ নাকে ঢোকে, এভুলটা প্রায়ই হচ্ছে আর হলেই মোহনের দুটো চোখ বুজে যায়, অথবা বাঁ কোণে চালের ফুটো দিয়ে দুটো মাত্তর তারা, নক্ষত্র। বেশী নয়, কম নয়। ঠিক দুটোই। এটাও ওর ভাল লাগে। আপনি আপনিই। কোন মানে নেই। হয়ও না। চালটা খড় খড় করে ওঠে। ঐ যাঃ বাঁশডগলাটা তো কাটা হোল না। এত ঝামেলায় ওগুলো কি আর ঠিকঠাক মাথায় থাকে। চুপচাপ কিছুক্ষণ কাটলেই জমির ব্যাপারটা গলায় মনসা কাঁটার মত বিঁধছে। ব্যথা নেই, স্বস্তিও নেই। ও বোঝে আর চোখে ঘুম আনা যাবে না। মশারিটা তোলে। লম্ফটা ধরায়। নেড়ে ছাখে তেলের বহর। দরজাটা খুলে চালে গোঁজা দুটো ছিপ পাড়ে। একটার বঁড়শিতে অল্প জং পড়েছে। কতকাল মাছ খায় না, মাছের আঁশ লাগলেই বঁড়শির রং ফিরবে। কেঁচো। জুতোটা গলিয়ে উঠোনে শিউলিতলায় খোলামের কানা দিয়ে খোঁচা ছায়। পিলপিল করছে। খোলামের ওপর তুলে নেয় কটা। ছিপদুটো বগলে নিয়ে খিড়কি খোলে। শ্যামলদের খিড়কিতে কান পাতে। কারও শব্দ নেই।

এমন কি কলটেপারও নয়। ঘুমোল নাকি। এত তাড়াতাড়ি তো ঘুমোয় না। বাঁ পাশে বাঁশবন, ডানপাশে শ্যামলদের বাড়ীর দেয়াল—কানাচ বরাবর হাঁটে। খুব সাবধানে। শব্দ হলে চলবে না। এর আগে একবার ধরা পড়েছে। কী লজ্জা, কী লজ্জা। প্রতিবেশী। কিছু বলেনি। পুকুরের গাবায় নামে। পড়পড় করে একটা নরম জায়গায় পা-টা ঢুকে যায়। কষ্টে সৃষ্টে পা উঠে আসে। জুতো আসে না। সেই পাঁকের ভিতর হাত চালায়। শক্তি খাটিয়ে তুলে নিয়ে আসে জুতো। লক্ষ্য রাখে শ্যামলদের রান্নাঘর। অল্প আলো রান্নাঘরের জানালায়। শব্দ না করার খেলা চললো। জুতো ধুলো। ছিপে টোপ খাটালো। পুঁতলো-পাড়ে। তারপর গাবগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে লম্ফটা নিভিয়ে ছায়। পুকুরে ছায়া পড়েছে আকাশের। বাতাস নেই। জল কাঁপে না। মনে হয় সারা আকাশটাকে পিন এঁটে ক্যালেণ্ডারের মতো কে যেন সেটে দিয়েছে জলে। ভারী ভালো লাগে দেখতে। এই ভালো। ঘুম না এলে উঠে এসো, ছাখো, পুকুরের শোভা। ওপারে ভারী বুড়ি তেঁতুলগাছটা কেমন ভয় বুনে যায়। ঝুপড়ি ঝাপড়ি তাড়কা রাক্ষসীর মতো হাঁ হাঁ কচ্চে। দুটো ডাল দুপাশে হাতের মত এলিয়ে। এই ভয় কথাটা মনে পড়ে গিয়ে বেশ মুশকিলে ফ্যালে মোহনকে। একটা জলজ আতঙ্ক উঠে আসে ভেজা মেয়েলোকের মত। গেল বছর মাঝিদের মেয়েটা এই পুকুরেই ডুবে মরেচে। ঠোঁটদুটো ঠাণ্ডা লাগে, পা দুটো নড়ে না। আঙুল মটকানো বন্ধ। খুব সতর্ক ভঙ্গীতে ইদিক উদ্দিক ছাখে। জলকে এখন সন্দেহ লাগে, এতক্ষণ তো নড়ছিলো না, তা হঠাৎ এত কাঁপছে কেন। তারাগুলো হাঁসের মতো ডুবছে-ভাসছে। একি ইয়ার্কি! মুখে ফুটে ওঠে 'রাম-রাম, রাম-রাম'। এরি মধ্যে জলে

শব্দ হয়। সজাগ হয়ে ছিপের কাছে এগিয়ে যায়। সড়কে লেজে হিন্দুস্তান। মাছ খেয়েছে। গাবগাছের কাছে ফিরে আসে। একো নড়ছে। বড় শোল-টোল। শিঙিও হতে পারে। শ্যামলদের জানালার দিকে দেখতে দেখতে ফুস্ করে লম্ফ ধরালো।—'ও, শালা তুমি। তাই এত নড়ন চড়ন। দেখতে এনু সোহাগী কয়,—না সোহাগী তোমার শরীরময়—শালা'। প্রবল ঝাঁকায় শূন্যে। ঢোড়া সাপটা মুখ ছুলে ছিটকে পড়ে জলে।

১০. এতো সকালে কেন যে ছাই আকাশটা এতো ময়লা হয়ে এলো। কত কাজ। আজ তিনবাড়ী যাবে। অন্য তিনবাড়ী। একদিন অন্তর পুজো প্রত্যেক বাড়ীতে। আটাশ ঘর যজমান। ভাগাভাগি করে নিতে হয়। বাসুবাটীমুখো হলে সারতে হয় একদিনেই ছটা বাড়ী। চান হয়ে গ্যাছে। একটু যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে। তা ঠাণ্ডার দিন তো আসছেই। ক'দিন পরে তো হিহি হিহি কাঁপতে কাঁপতে টুপ করে ডুবটি মারতে হবে। 'মোহন দা—' দরজা ঠেলে ঢোকে শ্যামল। বুকটা টিপ টিপ করে ওঠে। কাল রাত্তিরে কি দেখে ফেলেছিল নাকি। '—কাল নিরুদা অফিসে এসেছিল'। অপলক চেয়ে থাকে মোহন। 'পরশু ছেলেমেয়ে আর বৌদিকে নিয়ে আসবে, থাকবে কটা দিন'। '—তা হঠাৎ, কি ব্যাপারে এখনোতো ধান ওঠেনি—'। হেসে ফেলে শ্যামল—'না না—ছেলেমেয়ের কলেজ ছুটি, কদিন বেড়াতে আসছে, থাকগে ঘরদোর ঝেড়ে পুঁছে রেখো, আর সকালে আটটায় গাড়ীতে [illegible] ক্ষতীনকে পাঠিও'। অপলক তাকিয়ে চলে যায় শ্যামল। তা হঠাৎ কী জানি। বৌদি—ডাক্তার, আর মেয়েটা। আসুক। থাক [illegible]

মোহনের আর কি। ফেলো কড়ি মাখো তেল। খরচ করো, খাও থাকো—ভালো। না লাগলে চলে যাও। তবে ব্যাপারটা ভালোই, ক'দিন নিশ্চিন্দি হওয়া যায়। বৌমার হাতের রান্না। যত্নআত্তি। মেয়েটা ভালো ঘর থেকেই এসেছে। পয়মন্ত বৌ। বৌ-এর পয়েই চাকরী, কলকাতায় ছাপাখানা—সুখেই আছে। শুধু এদিকে যদি একটু দেখতো —তাহলে তো কোন দুঃখুই ছিল না। হাজার হোক মায়ের পেটের ভাই। মুখে দাদা বলিস। কাজে শুধু পর। তা যার ধম্ম যার কাছে' ছেলে-মেয়ে দুটো যে মোটে থাকতে চায় না। গাঁ নাকি ভালো লাগে না। রাত হলে হোল একবার, সেই যে লাটসাহেবের মতো বিছানায় উঠলো -হাগা-পেচ্ছাপ না পেলে নামার নামটি নেই। ভীতুর ডিম। মেয়েটার যদি গ্রামের দিকে বিয়ে হয়—তখন করবি কি। সে তো জেঠার বাড়ী নয়—দুদিন ভাল্লাগলো না তিনদিনের দিন ফিরে এলি। —'মাস্টার মশাই'। কে? মাস্টার মশাই, সে তো বাপ কবেই চুকে বুকে গেছে বাবা। সেই এগারো বছর আগেই। নামেই মোহনমাস্টার। আসলে পড়াতো সাবিত্রী। সকালে বেলা ঘন্টা দুয়েক গোটা পাঁচেক ছেলেকে নিয়ে ওরা বসতো। বেশ ক'বছর ছেলেপিলে এসেছে, পড়েছে। তারা কেউ কেউ বাপের মতো মুখ্যু আর চাষা হয়েছে কেউ কেউ বিদ্বান হয়েছে। বাইরে আছে। টাকা করেছে। 'মাস্টার মশাই'—'কে বাবা'? '—আমি মাস্টার মশাই, অসীম'-প্রণাম করে। বেশ কবার চুম খেয়ে আশীর্বাদ করে মোহন। চোখটা আলা কচ্চে কেন? সুখে না স্মৃতিতে। মোহন বোঝে না। 'আমায় চিনতে পারছেন'? দুবার শব্দ হয় মুখে। একবার ঢোঁক গেলে। ভুরুগুলো কুঁচকে ওঠে। ছেলেটি হেসে ফেলে—'আমি পাড়ুইদের মাস্টারমশাই, দিদি পাড়ুইয়েক

ছেলে'। এবার চিনতে পারে মোহন—'হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তুমি যেন কোথায় থাক, কি কর'। 'কলকাতায়, এখন পড়ছি'।—'ও, তা কি পড় বাবা, আই এ না বি এ'? 'আমি গেলবার এম. এস. সি পাশ করেছি, এখন রিসার্চ কচ্ছি মাষ্টারমশাই'। 'তা বেশ বাবা বেশ—হঠাৎ কি মনে করে'? 'আসচে শনিবার বাড়ীতে কালীপূজো, বাবা পাঠালেন আপনাকে বলার জন্য'। খুশী হয়ে ওঠে মোহন। একটা নিশ্চিৎ মোটা পাওনা মোহনকে আনন্দ দেয়। অন্ততঃ একটা কোরাধুতি, খান দুই গামছা, একটা পেতলের কি কাঁসার রেকাব, চাল-ফলমূলো আর তার সঙ্গে গোটা পনের নগদ টাকা। গলে যায় মোহন। কৃতজ্ঞতার ভঙ্গীতে ও হাতলাফি করে—'নিশ্চয়ই যাবো, নিশ্চয়ই'। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে পড়ে যায় অনন্তর কথা। অনন্ত ওর খুড়তুতো ভাই, আগে জগদ্দলে কারখানায় কাজ করতো। রিটায়ার হয়ে গেছে। এখন ও নজর দিয়েছে যজমানির ওপর। তার মানে তো মোহনের ভাতে হাত। তাড়াতাড়ি বলে-'জানো তো বাবা, অনন্ত এখন হঠাৎ করে যজমানি কচ্ছে, তা ওকে কিছু বলোনিত?' অসীম ঘাড় নাড়ে। 'বেশ করেচ, তোমায় বলি, ও এখন আমার যজমানদের ফুঁসলে নিচ্ছে। তো তোমরা হলে আমার আদি যজমান,—তোমরা কি আর বেইমানি করবে'? অসীম উশখুশ করে। 'তা একটু বসবে নাকি? তোমার জেটাই তো সেই বইলে চা খাওয়াতুম'। অসীম না না করে একটা পেন্নাম ঠুকে পৈঠে দিয়ে নামতে থাকলে হঠাৎ মোহন জিজ্ঞেস করে—'বুল্টু তোমার বন্ধু ছিলো না'? অসীম থমকে দাঁড়ায়। মৃদু ঘাড় কাৎ করেই চলে যায়। দরজার কাছে এসে নিশ্চল হয়ে যায় মোহন। অসীমের যাওয়া ভাখে।'

১১. হঠাৎ দুপুরের ঘুমটা বেশ ভালই হোল। এরকম স্বপ্ন বাদ দিয়ে ঘুম অনেককাল মোহনের হয় না। হয়তো কালীপুজো-প্রাপ্তি ব্যাপারটা কদিনের জন্য খুব নিশ্চিন্দি করে দিয়েছে। শেষকালে এসে খপ্ করে স্মৃতি ধরার মতন অসীমকে আবিষ্কার করেছে বুল্টুর বন্ধু হিসেবে। ফরফর করে পাঁজির পাতা উড়ে যায়। হুম্ হাম্ করে সে দিনগুলোর পায়ে নখ বেড়ে যায়। গাছ পালা শন্‌শন্ করে ছুটে এসে কানে কানে বলে যায়—এই বুল্টুকে তোমরা সকলে ভুলে গেছ। তা বটেই তো। সারা গাঁয়ে আর বুল্টুর নাম শুনতে পাওয়া যায়? আঙুলের গাঁট গুণে গুণে সাল তারিখ ঠিক করে বার করে ফেলে সে দিনটাকে। কাঁটায় কাটায় ন'টা বছর। মাত্র ন'টা বছর। ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। জাড়ের (শীতের) দিন। গ্রামের নিশীথ সকাল সকাল। খেয়ে দেয়ে সবাই বিছানায়। টিনের আরও কিছু কম ভাঙা গর্ত্তটার ভিতর দিয়ে এই এটুকুটি আকাশ—আর এদিক ওদিক ঘুরলে ফিরলে একটা তারা চোখে পড়তো। গুম্‌গুম্ গুম্‌গুম্ করে বেজে উঠলো বিসর্জ্জনের বাজনা। শিউলি গাছে প্যাঁচা চেঁচাল। নারকেল গাছ সড়সড় করে গায়ের ঢাকা ফেলে দিলো। দাশপুকুরের পাড়ে শিরীষ-গাছে ঝম্‌ঝম্ শব্দ। হেই বাবা—ডাকাত পড়লো নাকি। তার আগেই মেথর পাকরের বাড়ীতে ডাকাত ঘুরে গেছে। তবে? এবার? অস্ফুট ভেসে আসা কণ্ঠস্বরের গোপন আর্তি। কান পাতে গ্রামের সবাই। ধড়মড় করে ওঠে মানুষ। ঘুমের মাথায় আগুন। হোলটা কি। বুল্টুদের বাড়ী থেকে ওর কাকারা ছুটলো শক্তিপীঠের দিকে। আশ-পাশের লোকে টর্চ লাঠি নিয়ে ছুটলো কেলাব বাড়ীর দিকে। মোহনও। হপ্ হপ্ করে দুলতে দুলতে ছুটতে ছুটতে। সারা গ্রামখানকে কাঁপিয়ে

আছে উত্তর মাঠের আলে। জ্যোৎস্নায় ধান গাছ, জুনার জঙ্গল, মড়া-শ্মশান, ছেলেপোতা, স্পষ্ট ছবিটি। আলের ওপাশে সারি সারি বন্দুকধারী পুলিশ। কেলাবহাউসের সামনে একটা জীপ, সাইকেল চেন দিয়ে কুড়ি বাইশটা। পেছনে পুলিশের গাড়ী। সামনে আলের ওপর সারি সারি পুলিশ। একটা হামদোমত টেকো দারোগা, মুখে সিগ্রেট, চনমন কচ্ছে চাদ্দিক। হেঁকে বলে বার ছুটো সিপাই—'আলের এপাশে আসবেন না—জুনার জঙ্গলে লড়াই চলেছে'। লড়াই, লড়াই কেন! কিসের লড়াই, কার সঙ্গে? দারোগার মুখে কথা নেই, খালি ধোঁয়া বেরুচ্ছে। শ্যামলের চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে, কজনে ওকে ধরে বসিয়ে দিল। গোপাল গুম হয়ে জ্যোৎস্নার ভেতরে চোখ সেঁদিয়ে ভাখে—। সারা গ্রামের লোকের মুখে রা নেই। শুধু প্যাঁচার চেঁচানি, কুকুরের ঘেউ ঘেউ আর গুলির শব্দ। ঘণ্টা তিনেক পরে বন থেকে বীরেরা ফিরলো, চারটে বাচ্চা ছেলের লাশ টানতে টানতে। টেনে তুলে আনারও ইচ্ছে ছিল না যেন। পাড়ায় আসতেই কান্না, কান্না। কান্না পাড়ার লোকের, কান্না শ্যামল—গোপালের—কান্না শ্যামলের মায়ের। বুল্টুর শরীরে আটটা গুলী। ব্যাটা চেয়ে আছে—যেমন করে আগে চেয়ে থাকতো। মুখে কোথাও যন্ত্রনার চিহ্নও নেই। অতক্ষণ পর দারোগা কথা কয়েছেন, 'শাল্লা শূয়োরের বাচ্চা'। আর দারোগার টুঁটি টিপে ধরেছিল—এ বুল্টুর বন্ধু। কতদিন হয়ে গেল। কেলাবঘরে বুল্টুর একটা ফটো আছে। কি বছরে মালা পড়ে। কি-বছরে একবার করে ওর কথা মনে পড়ে সারা গ্রামের। ছুরা এই গ্রামের অনেককেই অনেকভাবে [illegible] শেষ [illegible] বুল্টুকে। শুধু আজও সারা গ্রাম জানতে পারলো না বুল্টুকে মারলোই কেন, আর লড়াই বা কেন? আর ওর [illegible]

বা কাদের। মাঝে মাঝে রাত্তিরে টর্চ নিয়ে জুমার পানে যেতে দেখা গেছে তিন চারজন ছেলেপিলেকে, জিজ্ঞেস করলে বলতো 'এই একটু বেড়াতে, মাঠেই'। মোহনের ভিতরটা অবিশ্যি এখনও হঠাৎ হঠাৎ হামদা-হামদি করে বুল্টুর জন্য। ছোট বেলায় ছাদ্দবাড়ি কি বিয়েবাড়ি থেকে ছাঁদা আনলেই একটা ভাগ থাকতো বুল্টুর। কোলে বসিয়ে সুয়োরানী-দুয়োরানী শোনাতে হয়েছে। কাঁধে চড়িয়ে হাটে নিয়ে গেছে। মোহন এখন সেসব ভাবে। শুধু ভাবে। এই ছোঁড়াকেও কি কম পোয়াতে হয়েছিল। পাক্কা ন-নটি মাস হাজত বাস করেছে। দারোগার গলায় আঙুলের দাগগুলো ক্রমে ক্রমে ধারালো নোখের মত ছেলেটার বুকের ভিতরের ধুকপুকিতে বসে যাচ্ছিল একটু একটু করে। নেহাৎ বাপের টাকা ছিল, লড়লো মামলা, তাই। মোহনের মন খারাপ হয়ে যায়।

১২. একটা সোমথ মেয়ে দুদিন এসে যদি শুধু চশমার কাঁচ ঘষে, হাই তোলে, আলগা এলিয়ে পড়ে, দাওয়ায় বসে থাকে আর শুধু বই পড়ে কার ভালো লাগে? মোহনেরও ভাল লাগেনি। দুদিন হোল এসেছিস, তা নিজের গাঁ একটু ঘোর, একটু দ্যাখ তা নয়কো একপাহাড় বই নিয়ে শুধুই বই গেলা। বার কয়েক বলেছে রিনিকে। মেয়ের ঠোঁট টিপে হাসি বই অন্য কিছু পায় না। আর যা পায় তার নাম খিদে নয়, গেলা, বই গেলা। রিরু সেদিনই সন্ধেবেলা কলকাতায় ফিরে গেছে। তা যা, কিছু ধরে দিয়ে যাবিতো হাতে। বৌমা ডাক্তার, রিনি আর মোহন নিজে। নিজেরটা না হয় চলে যায় কিন্তু ওরা। অবিশ্যি দিয়ে নিশ্চই গেছে। বৌমাকে। না হলে পেটের তাপ মিটবে কি করে।

রান্নার পাম-াী বলতে তো কিছুই নেই তবু তো জুটে যাচ্ছে। খিদমত তো খাটতে খুব হচ্চে না। আসলে এসব বৌমার ব্যাপার। কিছুই জানতে দিচ্ছে না ভাসুরকে। থালা বাটি গেলাস বিছানা মায় মশারী পর্যন্ত গুছিয়ে এনেছে। বৌ হ'ল পয়মন্ত। বৌ-এর গুণেই বাঁদরটার এমন লপরচপর। 'ঠাকুর মশাই',-যতীন ঢোকে। বাক্বোৎ, তাড়ির ভাঁড় নিয়ে এলো না কি! বিশ্বাস নেই। না। ভাঁড় নয়। মাথায় এক ব্যাগ আনাজপত্তর নিয়ে ঢোকে। অবাক হয়ে আনাজপত্তর দেখে মোহন। বউমা লজ্জিত ভঙ্গীতে আমতা আমতা করে-'ষ্টেশনে পাঠিয়েছিলুম, বাজারে'। 'ও, তাই বলি ব্যাটা এসমস্ত ঘাড়ে করে ঢুকচে কেন?' আরও একটু যোগ করে মোহন, 'তা বোস যতে, এটু চা-টা খে'যা। বুকটা কনকন করে ওঠে। নিজের বাড়ী নিজের ঘর, অন্য একটা মেয়ের মৃত্যু কর্তৃত্বে তাকে চলতে হচ্ছে। সাবিত্রী থাকলে এমনটি হোত না। যা হোগ যাহোগ করে কিছু একটা করতোই। কদিনের জন্য অবশ্য নিশ্চিন্তি। পারলে একটু জমকে ঘুমিয়ে নেয়া চলে। 'কটা বাজেরে রিনি'? রিনি কবজী ঘোরায়। 'দশটা বাইশ'। ও বাবা চান করতে হবে। যজমান। কাঁটার মতো বেঁধে। চান করে, এককাপ চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ে। একঘটি জল। কাঁধে উড়ুনি। ফর্সা কাপড়। ফর্সা পৈতে। ফর্সা রং। একটু লালচে আভা গড়িয়েছে এখন। বৌমা তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছে। 'তাড়াতাড়ি না ফিরলে আপনারও কষ্ট আমারও কষ্ট'। বড় আরাম পেল একথা-গুলোয়। কতকাল তো কাউকেই বলতে শোনেনি। আপন, আপনার কথাগুলি মাথার গ্রন্থি ছিঁড়ে কবেই যেন অলক্ষ্য কল পড়ার মতো টুপ করে পড়ে গিললো। আজ আবার চাগাড় দিয়ে উঠছে। কামারবাড়ী

আর দুটো ধোপারবাড়ী সেরে নিয়েই ফিরবে। ও, ডাকাতে বাগ্দীর বাড়ীটা না সারলেই নয়। পা চালায় মোহন। রোদটা ক'দিনের চেয়ে আজ কড়া। গায়ে বিজবিজ কচ্চে। মাথায় তাপ ঢালছে। তবু যদি এসব ছান্দ-পিণ্ডি সেরে বাড়ীতে কারও হাতের রান্না অপেক্ষা করতো তার জন্য, মানুষ তো এরই জন্যি সংসার করে। পরিবার চায়। নইলে সন্ন্যিসী হতে দোষ কী? একসময় অবিশ্যি সাবিত্রী ওর জন্যে ভাতের থালা নিয়ে বসে থাকতো। মুখটা থাকতো গম্ভীর। হাসি তার ছিল না। রসিকতা শেখেনি। সোহাগ সে জানতো না। ঠক করে ভাত দিতো। দিতে হয় বলেই খেতে দিত। রাত্রে শুতে হয় বলেই পাশে শুত, স্বামী হয় বলেই ঘরে থাকতো। অথচ মোহনের সামর্থ্যমতো যতটা করার সে করেছে। বাইরে খাবার পেলেতো ওরই জন্যি নিয়ে এসেছে। পূজোর সাদা কোরা লালপেড়েটাও ওর জন্য। নইলে নতুন শাড়ী তো দোকানেই নগদ দামে বিক্রি করে দিতে পারতো। রাত্তিরে যাত্রা ছাড়া কোন নেশা ছিল না। একসময় পাড়ায় যাত্রাও করেছে। একবার 'অহিরাবণ' পালায় হনুমান করেছিল। কি লাফানি চোপানি। বাপরে! মানুষজন তো হেসেই অস্থির শুনবে কি। সেই রাত্তিরে স্টেজে পার্ট বলার সময় সে' সাবিত্রীকে খোজায় ছিল ব্যস্ত। ভীড়ের মধ্যে জবুথবু হয়ে খুড়ীমার কোলের কাছটি সে বসেছিল। চোখে অপার বিস্ময়। হাঁ করে দেখছিল মোহনকে পরের দুটো দিনে সে সাবিত্রীর কাছে কাছে ছিল, পাশে পাশেও। তার তিনচার দিন পরেই সাবিত্রীকে কিনে দিয়েছিল চামড়ার হাতে ঝোলা ভ্যানিটি ব্যাগ। গোপালের বৌএর হাতে দেখে ওর ইচ্ছে হয়েছিল। সেই ব্যাগ ঝুলিয়ে সে বাপের বাড়ী গেল। পেছনে পেছনে মোহন। মাথায় একটা বড়ো পুঁটলি হাতে থলে। লাউ বেগুন, চাটি চেঁড়শ, মাছ

গাছের নারকোল নিয়ে গেছে শ্বশুরবাড়ি। লোকে হাসুকগে সাবিত্রী খুশী হোত। শেষবার গেছে সাবিত্রী যাবার মাসখানেক পর। তার বিবরণ মনে করতে ভালো লাগে না মোহনের। সে অপমান আরও অসহ্য। পেট ও হার মানে। তাড়াতাড়ি পুজো আচ্চা সেরে মোহন বাড়ীতে ঢোকে। গলা খাকড়ায়। 'বৌমা, নাও ভাত বাড়ো, নাড়ি ছিঁড়ে পড়চে'।

১৩. ডান হাতের মুঠোয় আছে পঁচিশ নম্বার চা, পঁচিশ নম্বার চিনি পারতপক্ষে বাঙাল বামুনের দোকানে যায় না মোহন। ছটাকার মতো কজ্জ করা আছে, বুড়ো গেলেই ধরে ক্যাঁক করে। কিছু একটা বলতে হয়। কাটাতে হয় যা হোক করে। ছটা টাকা একসঙ্গে দেবার চিন্তা মোহন করে না। নেহাৎ বৌমা পাঠালো। এ ক'দিন বাড়ীতেই চা খাচ্ছে। দোকানে খেতে হয় না। এটা ঠিক নেশা নয়। নেশার মতো। একটু পেলে মাথাটা চমকে নেয়া যায়। মন্দ লাগে না। হীরে তাঁতির সঙ্গে দেখা হয়। কুশল জিজ্ঞেস করে হীরে। মুহূর্তে বৌমাকে একটা কাপড় দেবার ইচ্ছে চাগিয়ে ওঠে। কোনদিনই তো কিছুই দিতে পারে নি। আজও পারবে না। তবু প্রশ্নটাকে আটকাতে না পেরে হীরেকে বলে, 'এগারো হাত রঙীন শাড়ী কেমন পড়বে রা।'—দামটা শুনে বিস্মিত হয়। দাম কি এতো বেড়ে গেছে! হীরে কি ইচ্ছে করে এত বেশী বললো! হবেও বা। ইচ্ছেটা তক্ষুনি মরে যায়। কালভার্টটা ঘুরতেই যতীনের বাড়ীর দিকে নজর যায়। অভ্যাসবশে একবার ডাকে, কেউ সাড়া দেয় না। ওর মেয়েকে দেখতে পাচ্ছে মোহন। একটা অশ্লীল গাল দিয়ে দাশপুকুরের দিকে ঘুরলো। শ্যামলদের বাড়ী পার হয়ে গিয়ে নজর যায় ওদের সদরের জানলার দিকে, মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে

রিনি। জানলার কাঠে মুখ রেখে। অন্ধকার করে এলেও রিনিকে ও স্পষ্ট দেখতে পায়। এটাই ছিল বুল্টুর ঘর। ভেতরে মেঘ ডাকে। মেয়েটা কি এখন বুল্টুর কথা ভাবছে। ঠিক অমনি করেই অমনি ভাবেই বুল্টুর সঙ্গে দিনরাত গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করতো। কতবার চোখে পড়েছে। চোখ নাবিয়ে নিয়েছে মোহন। কোন সময় গলায় শব্দ তুলে ওদের পেরিয়ে গেছে এই জোড়া নিমগাছের নীচে একদিন ওদের খুব কাছাকাছি বসতে দেখেছিল। ওদের চোখের দিকে চেয়েই বুঝতে পেরেছিল ওদের মধ্যে একটা ভাবসাব গড়ে উঠেছে। সেদিন শব্দ করা সত্ত্বেও ওর উপস্থিতি গ্রাহ্য করেনি। সেদিনই বুঝেছিল মোহন, সেদিনই কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালো মোহন। অস্পষ্ট কান্নার শব্দ। আস্তে আস্তে ডাকে- রিনি, মা'. রিনি ঝটিতি চোখে চশমা তুলে দেয়, কি এক কৌশলে শব্দ করে না। অন্যমনস্ক হয়ে যেন কামিনীগাছের পাতা দেখতে থাকে যেন মোহন কিছু বোঝে না। বুঝতে নেই। রিনি ঠিক অমনি ভাবেই স্বচ্ছন্দে বাড়ী চলে গেলো। এই যে মেয়েটা—যে শুধু চশমার কাঁচ মোছে, হাই তোলে, এলিয়ে পড়ে আর বই খোলে, এই, এই মেয়েটাও এতক্ষণ শুধু ওর একান্ত একজনকে অনেকখানি চাচ্ছিল-— আর কোনভাবেই পাওয়া যাবে না বলেই বোধ হয় শব্দ না করেও টুক করে ম্যাজিকের মতন কান্নার ঝাঁপটাকে নিজের ভিতরে গুটিয়ে নিলো। মোহন কি পারে বোঝে না, সব বোঝে, সব। বাড়ীতে ঢুকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী গুলো জমা দিয়ে রোজকার খেলা খেলতে থাকে মোহন। উবু হয়ে বসে পড়ে কুলগাছের নীচে। মাথা এলিয়ে তাকিয়ে থাকে আকাশ আর আকাশের ফুটকিগুলোর দিকে, যারা ওকে খুব কাছে নিতে চায়। আকাশ দেখা পেলেই মোহনের আর অন্য কিছু পায় না, দুঃখ না সুখও

না। কিচ্ছু না।

১৪. 'দাদা জলটা রইলো, রাত্তিরে খেয়ে আবার চাপাটা দেবেন। ভুলবেন না'। ভুলবে না মোহন। জল কেন? জলের তেষ্টা তো মোহনের নেই। রাত্তিরে উঠে কই মনে তো পড়ে না কবে জল খেয়েছে। তবে জল কিসের জন্য। দুমিনিটটাক চোখ বুজে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে। নিজের কেউ না থাকলে এমন করে জলটুকুই বা পাওয়া যায় কার হাত থেকে। হোক না নিরুর বৌ। এবাড়ীরই তো। মাগ্যিগণ্যির কথা ধরলে আসলে মোহনই তো এ বাড়ীর কর্তা। সেই কর্তাকেও জল দেবার মতোন একজোড়া হাতও নেই। পাশ ফিরে শোয়। নিরুটা একটু মুখ চাইলে কোন কষ্ট থাকতো না মোহনের। এমন অন্নপূর্ণার মতো বৌমা। না হয় অমেকের মতো শনিবার শনিবার বাড়ী ফিরতিস। ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করতিস। তাহলে মোহনকে আর খটি হাতে গুঁপো নিয়ে গ্রামকে গ্রাম লাট খেয়ে ঘুরতে হোত না। তা হবার নয়। নইলে সাবিত্রীর যাওয়া কেমন করে হোত। একটা সময় ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ওর আনন্দ হয়। হঠাৎ। সুখও পায়। তার এ সুখগুলো ওর হাতে স্মৃতি তুলে দেয়. স্মৃতি থেকে ছবি হয়, ছবি থেকে মানুষ। কতকগুলো অবাস্তব মানুষ ওর সামনে ঘোরাফেরা করে. হাঁটে, কথা বলে হাসে, রাগ করে, ভয় দেখায়। ও ভয় পায়। আজ অব্দি পর্যন্ত যে ঢাউস সিন্দুকটা ও দেখে, দেখে সেই সিন্দুকের ডালাটা উঁচু হয়, সেই অন্ধকার গর্তের ভেতর দুটো মাথা বেরোয়। কী ভালো ওদের দেখতে। একটা ছেলে, একটা মেয়ে। নেহাৎই বাচ্চা। গোলগোল পিটুলির মতো ওদের চোখ—উত্তুরে বাতাসে নারকোল পাতার ডগের

মতো ওরা নিয়তই দুলছে, দুহাত তুলে ধেই ধেই করে নাচে, নাচতে নাচতে মিলিয়ে যায়। মোহন স্বপ্নের ভেতরে উঠে দাঁড়ায়। প্রচুর শক্তি পেয়ে দুআঙুলে ডালা খুলে ফেলে, খুলে পুরনো ময়লা পড়া ঠাকুর পুজোর বাসনগুলো দেখে, পঞ্চপ্রদীপ, সাজি, ডালা, ঘট। সবকটা হঠাৎ নড়তে শুরু করে, শুরু করে দুলতে, সিন্দুকটাও। সিন্দুকটা এমন ইঁদুরের গর্তের ভিতর ধ্বসে যাচ্ছে, প্রাণপণ একটা পায়া নিয়ে ঝাপটে থাকে মোহন, মাটির ভিতর ওগুলো যেতে দেবে না। ক-পুরুষের সে তাও জানেনা, সিন্দুক ক-পুরুষের তাও না। তবুতো ওগুলো আছে, এই ভেবে ও জান ফাটিয়ে একটা জোর চাগাড় দেয়। ঠিক তারপরই সিন্দুকটা বড় হয়ে ওঠে যে দেয়ালের সঙ্গে চেপটে যায় মোহন, মাটির দেয়ালে ঢুকে যাচ্ছে মোহনের হাত, আঙুল, পা, শরীর। মাথা ঢুকতে যাচ্ছে এমনি সময় ওর হঠাৎ বৌমার কথা মনে পড়ে, ও চাঁচায় 'বাঁচাও, বৌমা বাঁচাও' ঘুম ভেঙে যায়। ও উঠে বসে। ঘটি থেকে জল খায়, আর বোধ করে এটা নিশ্চয়ই জানতো বৌমা, না হলে আজ রাত্তিরে বৌমা জলই বা রাখতে গেলো কেন আর, আজ তার জল তেষ্টাই বা পেলো কেনো! আর ঘুম হয় না। কাঠবেড়ালীর মতো আওয়াজ হয় দরজায়। হা হা করে। মোহন দাওয়ায় কুলুঙ্গীর নীচে বাঁশের ঠেকায় গা এলিয়ে দেয়। ডান পাটা আলসে ববাবর ছড়িয়ে বাঁ পা গুটিয়ে রাখে। হিম পড়ছে। আকাশে পাতলা জলের রং, একটু ফ্যাকাশে, তারাগুলো হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চাঁদ দেখা যায় না, যায় আলো। সেই আলোয় চোখে লাগে জোড়া নিমগাছ, বাড়ীর পাঁচিল, দাশপুকুরের তেঁতুল গাছ, শিরিষ। বাড়ীর সামনের নারকোল গাছ, গাছের পাতা, পাতায় চিকচিকি, শব্দহীনতারও একটা শব্দ থাকে, কান পাতে, বহুদূরের মৃদু বাতাসের যাতায়াত—খুব মৃদু,

দেখতে মোহনের ঘোর লাগে। কাপড়ের কোঁচাটা গায়ে লেপটে দেয়। আগাপাছতলা কান না পাতলে ধোঁকা দেয়। ঠকায়। এইসব দেখতে ঠিক শীত নয়, শীতের আমেজ গায়ে স্পর্শ করে। রোম খাড়া হয় না, রোমে কাঁপন লাগে। রাত্তির টুকু মোহনের আপনার মনে হয়, রাত্তিরের টুনব। মোহন উঠে দাঁড়ায়। ওর কি ঘোর লাগলো। পা টানছে কেন? উঠোনে নেমে দরজার খিলেনে হাত যায়।

১৫. একা একটা গাঁ, প্রত্যেক বাড়িগুলো আর পাড়ায় নেই, নিষ্ঠুর ভাবে একা হয়ে যায়। দাশপুকুর একা ঘুমোয়, গাছ-গাছালিতে নিঃশব্দ টাঙানো। মোহন হাঁটে। শক্তিপীঠে কেলাব হাউসের উঠোনে দাঁড়ায়। সামনে ধূ ধূ মাঠ। মাঠের ওপর হঠাৎ চাঙড় চাপা শ্মশান, একটু দূরে জুমা লোক টানে। মোহনকেও। টানলেও ভয় লাগে। মোহন বসে পড়ে কালীচাতালে। চাতালের ওপরেই বিশাল বেদী। বেদীর গোড়ায় অশথ গাছ। পুরোন। দাদুর মতো বুড়ো গাছ। এক একটা ডাল একদিকে ছিটকে ছড়িয়ে, কোথাও পাতা নেই, কোথাও থোক বাঁধা। বেদীর নীচে কুমকুমি পুকুর। প্রতিষ্ঠার পুকুর। ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে জল যায়। ইষ্টদেবতা আর পূর্বপুরুষের মানুষজনেরা তেষ্টায় পান করে। কোন্ সময় যে ওঁরা আসেন, জল খান তা কেউ জানেনা, জানতে হয় না, জানতে নেই। জলের রং এখন কালো, আঁধার দেয়া আর্শি। আকাশ, তারা, গাছের ডাল, বাড়ীর ফটো সব হুবহু এক রকম। উঠে এগিয়ে যায় আলে। পা'টা ভিজে ভিজে লাগে। হিম তাহলে পড়ছে, সারা উত্তর মাঠটাই গর্ভ-বতী বউয়ের মতো ফুলে উঠেছে, রাশি রাশি হলুদ গুঁড়ো করে ছড়ানো। ধান পেকেছে। ধানের গন্ধ ভারি নাকে লাগে, শুকনো বটফল ভিজোলে

এরকম একটা দাঁতে কেটে দেখি গোছের গন্ধ। শ্মশানের পাশে ছেলেপোতা রাতের বেলায় ওঁনারা সব ঘোরাফেরা করেন, খেলা করেন, গাছে ওঠেন, গাছ থেকে নাবেন, জলে সাঁতার কাটেন, জমির ধূলোয় গড়াগড়ি খান, একরাশি ফুটফুটে অশরীরী ছেলের রাজত্বি ওখানে। ওখানে মানুষের রাতে যাওয়া বারন। ওঁনারা রাগ করেন, রেগে লাল হয়ে যান, মানুষকে বিপদে ফেলেন, জান নেয়া ব্যাপারে ইয়ার্কী মারেন, ওঁদের অপছন্দ মানুষের গতায়াত। গ্রামের কেউ যায় না। মোহনও না। রাম রাম। যাবার কথা উঠলেই বুকের ভেতর বাজনা বাদ্যি বাজে। বিসর্জ্জনের বাজনা। কপালে তোলে দুটো হাত। এই মাত্তর যে ছাগলের মতো একটা চারপেয়ে জীব ছুটে গেল সাঁপুইবাড়ীর দিকে, ওটা ছাগলই কী না সে কথা ভাবতে ভাবতে দুর্বল হয় মোহন। জনমনিষ্যিহীন শক্তিপীঠে পায়ের ঠোক্কবে যন্ত্রনা টের পায় না, টের পায় ভয়। পা কাঁপে, টলে, যেতে চায় না, থেমে থাকে। তবু ভয়েভয়েই দাস কানাইয়ের বাগানে ঢোকে। আনারসের ধারে ঘেঁষবেনা। সে লোভ কত্তে গিয়ে একবার লতায় (সাপ) ছোবল দিয়েছিল, সে জ্বালা মনে উজ্জ্বল। ঠেস দিয়ে আমগাছের নীচে বসে। ঢালোয় বসতে ওর কষ্ট হয় না। আর ঠিক ঐ সময়েই একটা পাতা খসে, ওর গায়ে পড়ে না, পাশে। ওর গলায় খরা জন্মে যায়। ফেটে যায়, জোর করে ঢোঁক করে ঢোঁক গেলে। সেই সময়ে ওর পেচ্ছাপ পেলেও নড়ে না। পেচ্ছাপ করলে যাবতীয় পড়া পাতায় পড়তে পড়তে নিশ্চিৎ করে শব্দহীনতায় একটা ভৌতিক শব্দই ছড়িয়ে দেবে আর রাতের বেলায় সেঃজিনিস বড়ো সুখের নয়, তা বেশ ভালোই জানে মোহন। মনকে বাঁধে। জোর আনে। এবং উঠে দাঁড়ায়। তারপর পেচ্ছাপও করে। কপালে কলাপাতা লাগে। মরা মানুষের হাতের মতো। মোহন হাত

বাড়ায় ঠোঁটের মতোই ভিজে, গাছপালার পাতার জালতি দিয়ে মেয়েদের কাপড়ের ছাপের মতো কলাপাতায় আলোর ছাপ। মোহন হাত তার সেই জায়গাটায় শুধুই হাতের দু একটা ঘনিষ্ট রেখা দেখে। ভয় কেটে যাচ্ছে একটু একটু। ভেতরে একটা নকল মোহন আছে, আর দিনের আলোর মতো স্পষ্ট চেনাশোনা জিনিষগুলোও মওকা পেয়ে সেই মোহনটাকেই ভয় দ্যাখাচ্ছে নিয়ত। এমন সময় পাতলা আড়বাশির সুর শোনে। কয়েক পল কান পেতে থাকে, তারপর সুর শুনে পা বাড়ায়। এতো রাতে কে বাজায়, ক্যানো বাজায়। কে বাজালো ভাবতে ভালো লাগে না, যে কোন একটা মানুষই। কিন্তু কেনো বাজায় ভাবতে গেলেই গায়ে কি একটা খেলা করে যায়, ভেতরে যেন ক'জন, ছটফট করে, সামনে কে একজন হাতে টান মারে, পা দুটো কে যেন ঠেলে দেয়। মোহন পাকবেপাড়াও পার হয়ে যায়। পার হয় দুলে পাড়া, পার হচ্ছে আদক বাড়ীগুলো, পৌঁছে যায় দাশপাড়ায়। সুর শুনে একটা চালার সামনে দাঁড়ায়। পড়ি পড়ি করেও ঘরটা পড়ছে না। ফাঁকা বাড়ীতে ঢোকে, ঢুকতেই বাঁশী থেমে যায়। থেমে যেতেই মোহন দাঁড়ায়। 'কে'। মোহন সাড়া দেবে কিনা ভাবে। 'কে' 'আমি মোহন'।—'ঠাকুরমশাই, এত রাত্তিরে আমার কাছে,' নিরঞ্জন বাইরে থাকতো, কেউ বলে বিদ্বান, কেউ বলে মুখ্যু, কেউ বলে ওস্তাদ লোক. কেউ বলে মাগীবাজ, কেউ বলে—এইরকম অনেক কিছুই বলে। মাত্তর একবারই ওর ঘরে ঢুকেছে মোহন, রাশি রাশি মোটামোটা বই, শুধু বই, লাউয়ের খোলায় তার বাঁধা একটা যন্তর, গোটা ছ-সাত আড়-বাঁশি। নিরঞ্জনের সঙ্গে ওর বিশেষ ভাব নেই, নিরঞ্জনকে ওর ভালো লাগে।

১৬. কাপড়ের বড়ো ন্যাকড়ায় রাখা আছে পঞ্চবিল্বপত্র। একশো আটটা লাল জবা। আজ শনিবার। নিশি পাড়ুইয়ের বাড়ী কালীপূজো। বড়ো মারাত্মক। সারাটা দিন উপোষ। জলও বারণ। বারণ থুতুও। থুতু না ফেলা বড় কষ্টের। আনমনে অনেকবার থুতু গিলেছে। একপা দুপা হেলে দুলে হাঁটতে হাঁটতে মনে তরাস লাগে। কোলে পাড়ায় এক বামুন পূজো করার আগে মাগুর একটা বিড়ি খেয়েছিল। মা তার প্রতিশোধ নিয়েছেন। বাপরে! ভাবলে বুক খুলে যায়। পূজোর থানে আগুন লাগলো। বামুনকে পথে সাপে কাটলো। ঘাড় যে সেই কাৎ হয়েছে আর খাড়া কত্তে হয়নি। যদিও মোহনের ভার পূজোর নয়। জোগাড়ের। তবু যতটা শুদ্ধ হওয়া যায় আর কি! অন্য পূজোতো নয়। একেবারে রক্তখাগীর পূজো। জোড়াপুকুর ধার পার হতে গিয়ে একবার চোখ পড়ে পুকুরে। একটায় পানা। অন্যটায় জল নেই। চোখ মন এক করে খানিক দেখে নেয়। মাছ থাকলেও থাকতে পারে। থাকলে জাওলাই থাকবে। না এসব ভালো নয়। পূজো করতে গিয়ে হঠাৎ মাছ খাবার ভাবনা কি আর ভালো। পা ফেলারফারাক বেড়ে যায়। একটু বা তাড়াতাড়িও। নিশি পাড়ুই-এর বাড়ী পৌঁছে ও যা একবার না ভেবেও ভেবেছিলো ঠিক তাই দেখলো। অনন্ত ওর আগে পাতা-ফাতা নিয়ে হাজির। দোরে ভালো মানুষটির মতো বসে। সঙ্গে মেজো ছেলে। মাথার ভেতরে তাপ বাড়ে। চোখেও। 'শালারা' ওদের দিকে তাকায় না। বাদল চক্কোত্তি পূজোয় বসবে। তারই কসরৎ চলছে। রাত্তিরে ঠাকুর আসবে। তার আগে এই সন্ধ্যেবেলাতেই যোগাড়-যাগাড় সারা হয়ে যাওয়া ভালো। মোহনের দিকে আড়চোখে তাকালো চক্কোত্তি। কাছে সরে এসে ফিস্‌ফিস করে, 'কিহে, অনন্ত তো আগেই এয়েছে। তা ঘরে ঘরে বিবেদ করবে নাকি'। মোহন আস্তে

আস্তে বলে—'আমার বলে আসা হয়েছেল'। 'অ'—চক্কোত্তি আবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নিশি পাড়ুই কি দেখেও দেখছে না। না এড়িয়ে যেতে চায়। অগত্যা এগোয় মোহন। 'কি বাবাজী, বিল্বপত্র তো আমারই যোগানোর কথা, তা অনন্ত এখানে কেন'। নিশি বিপদ বুঝে বলে, 'তা এটা কি আমার জানার কথা, আমরা আপনাদের যজমান,—এখন আপনি বিল্বপত্র যোগাবেন না আপনার ভাই—সেটা আমি কি করে বুঝবো ঠাকুরমশাই'। 'আপনার ছোটছেলে কিন্তু আমারই বলে এসেছেল'। 'তা তো বুঝলুম—কিন্তু এখন কি করবো আপনিই বলুন'? 'বেশ, তবে আমি চলি। এইবার কাজ হয়, ওপর থেকে অসীম ছুটে এলো,—ছাদে একটা ঘরে নিয়ে গেলো, তারপর কানেকানে বলার মতো বলে, 'আপনি এখানে বিশ্রাম করুন, খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি, আর ঘাবড়াবেন না, আপনার পাওনা আপনি পাবেন, মোহন চিলেকোঠার ঘরে বিছানে গড়িয়ে নেয়। নইলে বাড়ী গিয়ে বলবে কি! আজ সারাটা সকাল যা গল্প শুনিয়েছে বৌমাকে। খেয়েদেয়ে ওর শরীর ভেরে আসে। ও ঘুমিয়ে পড়ে। নিখাদ ঘুম। অথচ বাড়ীতে শুলেই ঘুম আসতে চায় না। ভোরের দিকে পুজোর কাছে একবার গেলো, তারপর সূয্যি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কাপড়, গামছা, ফলমূল, চাল আর ব[..]মোটা টাকা ট্যাকে করে ফিরে এলো বাড়ী। পাড়ুই-বাড়িতে তার যত্নআত্তির কথা চার কাহন করে শোনালো বৌমাকে। বৌমা হাসে। হাসে মোহন। হাসতে হাসতে ও ভুলে যায় অনন্তর আচরণটা। শুধু মনটা একটু খারাপ লাগে। কালীপুজো সেরে এলে সাবিত্রী ওকে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে ডেকে নিয়ে যেত ঘরে। তারপর পাখার হাওয়া করতে করতে জিজ্ঞেস করতো—'হ্যাগা, কাপড়টা কি

ভাল

গয়রদের। নগদ কতো'? মোহন এ উত্তরগুলো একটু রয়ে সয়ে দিত।

১৭. হঠাৎ-বৃষ্টির সঙ্গে মানুষের কখনো বনিবনা থাকে না, কথাবার্ত্তাও। প্রথমে পালা পালা মেঘ ম্যাজিকের মতো আসে যায়, তারপর জুমার মাথা টপকে কি চুল উড়িয়ে দিয়ে যে হাওয়াটা বোম্ বোম্ করে ছুটে আসে, মেঘগুলোকে কান ধরে—ইস্কুলের ক্লাস থেকে—শাস্তি দেয় এক জায়গায়, একত্রে। তখন হাওয়া থাকে না। মেঘগুলো হঠাৎ শাস্তি পেয়ে ইজের ভিজিয়ে দেয়। ভয়ে। মানুষের গায়ে ঐ ইজের ভেজানো জল পড়লেই ভিতর শুদ্ধু কনকন করে ওঠে। শীত আসে, তারপরের দিন আরও জমপেশ করে শীত আসে। তারপরের দিন আরো। অনেক। আজ এরকমই ঘটছে। হালকা মেঘের ছায়ার ভিতর কাঁপা জলরেখা, পাতায়, মাটিতে, চালে, এমনকি গায়েও। মোহন চোখকে অন্য কোথাও পাঠায় না, বিষ্টির এই অসমান শরীরগুলো দেখে। কিংবা এমনধারা বর্ষা এলে মোহনের দেখা পায়। তবে ভয় আছে। শীতকালের এরকম আচোট বিষ্টি চাষকপালে লোকের সয় না। বিষ্টি-খিতু না হলে ধান পাকার সময় কাটার ব্যাপার আছে। চাই কী নাবি জমিতে জলও শুকোবে না। গোড়া পচে, পাতা, এবং ধানও। এ বিষ্টিকে দেখে অবশ্য মনে হয় না, সে ভয় থাকলেও থাকতে পারে। বৌমায়া কেউই ঘুমের মধ্য থেকে উঠে আসেনি। আকাশটা শুধু ফর্সা হয়েছিল, তারপর ময়লাও হলো। এ সময় কাঁথা জড়িয়ে পা গুটিয়ে ঘুমোনো কিংবা না ঘুমোনো চলে, কিছুতেই উঠে এসে বিষ্টি দেখা চলে না। মোহনের চলে। তিস্তার সালে এ সময় ন'দিন ধরে বিষ্টি হয়েছিল। ধান পায় নি। চালের দাম চড়েছিল। তবু একেবারে আকাল-চচ্চড়ে দাম

ছিল না। খেতে পেতো লোকে। এই রকমই একটা পাঁতাভাব বিষ্টির সকালে মোহন শ্বশুরবাড়ী গিলো সাবিত্রীকে ফেরাতে। ভিজে, ঠাণ্ডা লম্বা শরীরটা নিয়ে বাড়ীর উঠোনে দাঁড়াতেই শাশুড়ী গঞ্জনা দিলেন, ... 'আবার মত্তে কেন, মেয়েকে তো আমার কাঠ করে দিয়েছো, তা, এখুনিই যমমুখো হও, বড়ছেলে এলে যে অনর্থ করবে।' তাই কি হয়। এই জন্যই কি এসেছে মোহন। গড় করে। শাশুড়ী পা সরিয়ে ওঁর গরম মেজাজটা ঠিক রাখেন। আগের রাত্তিরে খাওয়া হয়নি, শ্বশুরবাড়ী থেকে না খাইয়ে পাঠাবে না অন্ততঃ এ বিশ্বাস ওর ছিল। সাবিত্রী দেখা করেনি। কিছুক্ষণ চুপ করে ভেবেছিল করারই বা আছে কী। ওকি বউয়ের হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গাড়ীতে উঠতে পারবে? তাতো সম্ভব নয়—তার চে বরং, আর একবার —দরজা বন্ধ করতে করতে ঠাকরুণও বলেছিলেন, 'আমার কপাল'। ওর লম্বা শরীরটায় কে যা ফেলেছিলো, ঐ মুহূর্তেই কতটা ছোট হয়ে যাচ্ছিল ভাবতে ভাবতে ফেরৎগোষ্ট হয়, আর বাড়ী টপকাবার পরেই পিঠে এসে পড়ে একটা পোড়া মাটির চাঙড়। কোন রকমে বাঁ হাতে পিঠের একধার চেপে মৃদু গতি বাড়িয়েছিল মোহন। সাবিত্রী কি এটা জানে? এখনো জানে? তারপর গাড়ী চেপে, চতুষ্পার্শ কোঁচকানো—সিল্কের ঘোসপুরনো পাঞ্জাবী আর প্রায় ফর্সা কাপড়ে বাড়ীতে ফিরেই যতেকে বল্লে—'কত খাতির বুইলি যতে, বললে—সাবিত্তিরি আর কটা দিন পরেই না হয়—'। সেদিনও শুধু চোখ জ্বালা করেছিল। যতে কি বোঝেনি। হয়তো। কিংবা নয়। সেও ছিলো এই বিস্তি খেলার কীর্তি। আজ ভিতরে কেন এমন হাড়ের ঠকাঠকি শুনছে মোহন। কেন মনে হচ্ছে মাংস গুলা পাকিয়ে যাচ্ছে। কেন এমনধারা রক্তে উনুনের আঁচ

লাগছে। বৌমা দরজা খোলে। মোহন কাঁথাটা রেখে দরজা খুলে বের হয়। বৌমা অবাক হয়, বলে—'একি এই ঠাণ্ডায়, বিষ্টিতে'? মোহন বাইরে থেকে জবাব দেয়—'ধানগুলোর কী দশা হোল, একটু দেখে আসছি বৌমা'। 'কিন্তু অসুক-বিসুক—' 'না, জলে ভিজলে কি কারু অসুক করে, আমার তো করে না'। ওয়ান-টু ওয়ান-টু করে হেলে দুলে অপ্রাসঙ্গিকভাবেই মাঠের পথ ধরে মোহন। আসলে অন্য কিছুই নয়— বাড়ীতে বসে না থাকার তাগিদটাই শুধু ভিতরে ভিতরে তালগাছের মতো অনবরত পাতা নাড়াচ্ছিল। ঠিক তাই।

১৮. ঘন কুয়াশার মতো বৃষ্টি গলছে। ফোঁটা নেই, শব্দ নেই। গায়ে কাপড়ের খুঁট। হাতের নীচেটা ভিজছে। এখন তো কষতির দিকেই। গ্রামের অনেকেই বেরিয়েছে। ভরকুণ্ড গাছটা পার হতে গিয়ে ওপরে তাকালো। টপ করে একটা ফোটা। বাঁ চোখের ধার ঘেষে। একটা বড়ো পাতার আড়ালে একটা শালিক ঝিম মেরে, কালভার্টের উঁচু জায়গাটা ভিজে পাথরের মতো। কলাবাগান থেকে দুবার কাশির শব্দ শোনা যায়। প্রাত্যাহিক কাজ সারছে কেউ। রাস্তাটা বাঁক নিতে অনেকটা জায়গা ঝুম করে ফাঁকা হয়, দোকান দুটো বন্ধ। এখনও খোলেনি। কেলোববাড়ীতে কেউ নেই। ক্যাঁচ কাঁচ আওয়াজ তুলে কল টিপছে একটা বউ। বড় আলের ধারে কাস্তে নিয়ে দাঁড়িয়ে কানাই দাস। আকাশ দেখে ঠাওর করে বিষ্টি জোর পড়বে কিনা। তার তো কোন ইশারাই দেখতে পায় না মোহন। বরং উত্তর কোণে নীল দেখা যায়। কানাই বলে—'এতো সকালে কোথায় গো'—মোহন হাসে। কথা বলে না। কানাই আর প্রশ্ন করে না। ভিজে ন্যাকড়ার

মতো ধানগাছ মিইয়ে পড়েছে। যদ্দুর দেখেলেই চাপা হয়ে যাবে। শীষগুলো নতমুখ। দুপাশেই ধানগাছ। মাটি ভিজে। কাদা নেই। আলের ধারে থোকবাঁধা ঘাস—মুতো। মাঝে মাঝে বনগাছ। বনগাছে মাকড়সার জাল। জালে ফেঁাটা, বিন্তির। ঘাস থেকে ছিটকে পড়া জলে ভিজে যায় ন্যাকড়ার জুতো। ডান পায়ের ফুটোর মধ্যে পড়ে জলের ফেঁাটা। ঠাণ্ডা লাগে। আজবনগর পোলের ধার পর্যন্ত ফাঁকা। লোক নেই। বুড়ো বটগাছটা দাড়ি-চুল বিছিয়ে, ঝিমোয়। মড়াশ্মশানের কাছে চলে আসে মোহন। উঁচু উঁচু গাছগুলো ডালপালা সমেত অধিকার করে। নীচে বুনো জঙ্গল। ঢুকতেই চোখে পড়ে পোড়া কাটাকুটি। ভাঙা মাটির সরা, হাঁড়ি। ছেঁড়া মাদুর, কানি। ফাটা বালিশ। শ্মশানের ভিতর একটা শব্দ করা ভিজে বাতাস। এ বাতাস শুধু এখানেই আছে আর কোথাও নয়। মড়াশ্মশানের আরো ভিতরে কাশের শর। ঝাঁক ঝাঁক। আধ ভেজা তুলোর মতো এদিক-ওদিক ছড়িয়ে। হঠাৎ হঠাৎ উঁচু উঁচু ঢিবি। কারো তৈরী নয়। আপনিই। আরো একটু ভিতোরে ছোট সাদা ধবধবে একটা বাছুর। চোখ খোলা। জিব বার করা। জিবটা শেয়ালে খেয়েছে খানিকটা। একটা চোখ খোবলানো। পোঁদের দিকেও খাওয়ার চিহ্ন। গাটা ঘিনঘিন করে। ঘুরে পড়ে মড়াশ্মশানযাত্রীর কুটিরের দিকে। এক্ষুণি ভেঙে পড়বার মতো একটা খোড়'চাল। খাওয়া-মাটির দেয়াল। বাঁখারির আগোড়। ভিতরে একটা মাঝারি সাইজের মাটির কলসীর গলায় চাঁদমালা। মাটি ছুঁয়ে কপালে ঠেকায় মোহন। মাটি থেকে উঠে আসে পাখীর পালক—লম্বা, আঙুলের মতো। কুটির পার হয়ে পুকুরে নামে। হাত ধোয়, মুখ ধোয়, জল খায়। গভীর পুকুর কালো

জল, জলে গাছের ছায়া। নিঝুম! একটা ভাঙা ভয় বাতাসের সঙ্গে মিলেমিশে বয়ে যায় জলে, জল তরঙ্গিত হয়। মোহন উঠে পড়ে। শ্মশান পার হয়েই ছেলেপোঁতা। এই ফাঁকটুকুতে মৈনু শেখের খেত। ছোলার। গাছ হয়েছে লাগসই। ফুল ধরেছে। খোসা ছাড়িয়ে ক'টা ছোলা খায়। নরম। মুখে চাপলেই গলে যায়। মিষ্টি মিষ্টি। এতক্ষণে আকাশটাও অনেকটা মুখ তুলেছে। আনমনে ছেলেপোঁতায় পা দেয় মোহন। দিয়েই ভাবে ক'দিন আগে তারা ঘোষের পো এখানে এসেছে। ঘুমুচ্ছে চিরতরে। দাঁত খুঁটতে খুঁটতে কবর দেখতে থাকে। আলগা মাটি খোঁজে। এইরকম দেখতে দেখতে একটা লম্বা বেল গাছের তলায় এসে দাঁড়ায়। বেলগাছের পাশেই করমচা। বড়সড় হয়েছে এখন। ওখানে দাঁড়াতেই পুরনো পাঁজির পাতা থেকে খস খস শব্দ তুলে উনিশ বছর আগের পাতাটা খুলে যায়। এই রকম শীত না শীত—জোলো সকালে মোহন একটা মরা ছেলেকে পুঁতে ছিল ঠিক এই জায়গাতেই, এই বেলগাছের নীচে, এই করমচা গাছের আড়াআড়ি। মরা ছেলেটার মুখটা ছিল একটু বাঁকা, চিবুকের মধ্যিখান বরাবর কালো দাগ। হয়তো বা জড়ুল। সাবিত্রী মাত্র একবারই প্রসব করেছিল। মরা রোগা টিঙটিঙে সাদা ছেলে। যার বাপের নাম মোহন রায়, নিবাস—মধুবাটী, পেশা—পুরুতগিরি। মাত্র একবারই সাবিত্রীকে সন্তান দিতে পেরেছিল মোহন—আর সাবিত্রীও তাকে মাত্র একবারই বিনিময়ে দেয় মরা ছেলে। সেই ছেলেকে উনিশ বছর আগে এইখানে মাটিতে শুইয়ে মোহন বলেছিল 'ওঁ শান্তি'। তিনবার। সেইসব কথা ভাবতে ভাবতে কখন বসে পড়েছিল মোহন, বসে পড়ে আঙুল চালিয়ে আনমনে মাটি খুঁড়ছিল, মাটি খুঁড়ে কি আর সেই সাদা পায়রার মতো ছেলেকে

জাগানো যায়, না যাবে। সম্বিৎ পেয়ে মাটি ছেড়ে ওঠে। হাত ঝাড়ে। তারপর ছেলেপোঁতা ফেলে মাঠে নাবে। ঘরমুখো হয়। ততক্ষণে রোদ উঠে গেছে।

১৯ যতে খবর দিয়ে গেছে রাস্তার জন্য জমি মাপজোক করতে কন্ট্রাক্টর আসছে। কাল বেলা দশটায়। খবরটা পাকা-নিখাদ করে দিয়েছে চৌকিদার। দু'জনকে সাক্ষী রেখে একটা নোটিশ সেঁটে দিয়ে গেছে কপাটে। এখন তুমি যাও আর নাই যাও জমি নিয়ে নিল সরকার। দু'মাস পরে বি. ডি. ও অফিসে টাকা পাবে। ছশো ছাপ্পান্ন টাকা। যেন জমিটা পতিত, বিক্রিবাটার মানুষ পাচ্ছে-না—সরকার কৃপায় হাত বাড়িয়ে দয়া করলো কটা টাকা ছুঁড়ে দিয়ে। কি দেশেই যে বাস করে! মোহন ছাড়বে না। দেখে নেবে এক হাত। যা হয় কপালে। যতেকে দিয়ে একটা তলদা কাটিয়েছে। সেটাকে ঝাড়া-মোছা চলছে এখন। বাঁশপাতা আর কঞ্চিগুলো সারা উঠোনেই ছড়িয়ে। চাঁছতে চাঁছতে দুমুখ সরু হয়ে গেছে। লাঠিটা মোলায়েম হয়েছে। এক ঘাঁপ্ ঠেকালেই সোনা। দেখতে হবে না। দুর্বল বুকের রাঁচগুলোর ওপর সেঁটানো চামড়ায় খোর বাতাস লেগেছে। উঠছে নাবছে দ্রুত। কাউকে কিছুই বলে নি মোহন, যতেকেও। যা হবে শালা সামনা-সামনি। বলে করে কি আর কিছু হয়, না হচ্ছে! সকাল বেলা বৌমা বলছিল 'আর ভালো লাগছেনা। কটা দিনতো কেটে গেল'। পরশু ভাই আসবে তরশু নিয়ে যাবে, তা যাক্। নিয়েই যাক। বৌমারই যখন ভাল লাগছেনা, তখন কীই বা করার। মোহন একবারও অনুরোধ করেনি! তলদাটাকে রেখে দিল দোরে। চান করে বেরুলো পুজো সারতে। পুজোটুজো

সেরে একবার প্রধানের কাছে যাবে শেষ চেষ্টা করতে। যদি কিছু হয়। হবেই বা কি? যখন নোটাশ পড়ে গেছে তখন কি আর প্রধান জানে না ব্যাপারটা। নিশ্চয়ই জানে। মনস্থির করে, যাবে না—কারো কাছেই। ছ'শো ছাপান্ন—মানে ওর ভাগে পড়বে তিনশো আটাশ, নিরুর অর্ধেকটা। নিরু অসুখী হবে না। আলগা এতগুলো টাকা। আপনা আপনি আসছে—ও হাত বাড়িয়েই আছে। মোহন ভুরু দু'টো তুলে একবার চিন্তা করে নেয় আসছে বছর—তাহলে ধান আর আর পড়ছে না মাঠে। এ্যাদ্দিন পরে ও পুরোপুরি ভিখিরি হোল। নিরানন্দ ওর তারের যন্তরটা নিয়ে ঢুকলো। মোহন অবাক হয়। কী ব্যাপার হঠাৎ ওর কাছে কেন। না ওর কাছে নয়। রিনির কাছে। রিনি এগিয়ে ওকে ডেকে নিয়ে যায় ঘরে। মোহনের অস্বস্তি হয়। লোকে অনেকরকম কথা বলবে। বৌমার মুখে শুনলো রিনি আর ডাব্বুর নাকি গ্রাম বেড়ানোর সখ হয় আর গ্রাম বেড়াতে গিয়েই আলাপ। গান শুনেছে, বাজনা শুনেছে। আর আজ আসার নেমন্তন্নও করে এসেছে। এখন গান বসবে বাড়িতে। মোহনের এসব কোনদিনই তেমন ভালো লাগেনি। ভালো লাগতো যাত্রার গান। এরা সে সব গাক দিকি। একবার মারুক দিকি একটা হাঁকাড় 'শচীমাতাগো'—সন্তিসি দাসের মতো। রাতের অন্ধকারে দু'মাইল পথ অতিক্রম করে যেত, মারুক ওরকম একটা টান, পোঁদ ফেটে যাবে। পিলে গলে যাবে। যন্তরটা বাজতে আরম্ভ করলো। নিরানন্দ গলায় আওয়াজ তোলে 'বাতাসে উড়লে তুলো দেখবে বসন্তরে'। মোহন গুটিগুটি বেরিয়ে যায় বাড়ী থেকে। বৌমা খুঁটি জাপটে মিটমিট হাসে।

২০, একটা রাত্তির থাকতেই হ'ল থানায়। গারদের ভিতর। লম্বা লম্বা লোহার রডের বড়ো ফাঁক দিয়ে হু-হু উত্তুরে বাতাস ঢুকেছে। কনকনিয়েছে সারাটা রাত। তার ওপর মশা। নীচে প্রথম থেবড়ে বসেনি মোহন, তেল চিটচিটে ময়লা। বসলে পাছায় ধরে যায়। ঘেন্না ঘেন্না করছিলো। চারদিকে গন্ধ। বমি পায়। শেষরাতে কাপড়ের খুট জড়িয়ে আধশোয়া অবস্থায় একটু ঘুমিয়ে নিয়েছে। রতন আর গোকুলও সঙ্গে আছে দোষ যেন শুধু এই তিনজনেরই—আর কারো নয়। ধান মাড়িয়ে মাড়িয়ে ফিতে পাতছিল একজন লোক। ওদের দল থেকে রব ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। হৈ হৈ করতে করতে এগোয় ওরা। আর এতদিনের গভর্মেন্টের বিরুদ্ধে রাগটাইতো গভর্মেন্টের লোকের ওপর লাঠি ছুঁড়ে দিল। বুটজুতো পরে পাকাধান-ক্ষেতে নামলে কার না রাগ হয়! মোহনেরও হয়েছে। ব্যাপারটা সহ্যের বাইরে চলে গিসলো। ছ'দিন ধরে যে তলদাটা ঝাড়াই মোছাই করেছে, লোকটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিয়েছে ওইটাই। যতে হাতটা চেপে ধরেছিল, কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে, হাত থেকে ঢিল উড়ে গেছে ততক্ষণে, মাথায় লাগেনি, লেগেছে পিঠে, তার পরই হোল মজাটা, দুদ্দাড় দুদ্দাড় ওরা ছুটলো, পুলিশ ততক্ষণে তাদের কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। হাতের লাঠিই যথেষ্ট। দুমদড়াকা পড়লো কয়েকথা। তারপরেই আঁচে জল পড়ে গেলো। গ্রামের দিকে ছুটতে লাগলো মানুষ। পুলিশ বেছেবুছে এই তিনজনকে তুললো গাড়ীতে। মদন দাসের আর পাত্তা নেই। মাইক খোলা রেখেই ছুটেছে কোথায়। শুধু ওদের লাল ফ্লাগটা উড়ছিলো নিঃশ্চুপ। বাঁ কনুই-এ লাঠি পড়েছে জোরে। এই শীতে ব্যথাটা বাড়ছে বৈ কমছেনা। থানায় নিয়ে গিয়ে অবিশ্যি মারধোর

করেনি। তবে ভয় টয় দেখিয়েছে। এবার কিছু করলে জেল নির্ঘাৎ, শিবের বাবাও বাঁচাতে পারবে না এ জীবনে।

তারপরের দিন মদন দাস কিছু লোক নিয়ে থানার বাইরে মাইকে অনেক কথা চালাচালি করেছে, হাটের লোক আর কৌতূহলী মানুষ জমে গেছে থানার চারপাশে। অবশেষে এম. এল এ. এসে মিটিয়ে দিল সব। এম. এল. এ. কে এই নিয়ে তিনবার দেখলো মোহন। একবার ভোটের সময় বাড়ীতে, আর একবার বাসুবাটী হাটতলায়, মাইকের সামনে কিছুক্ষণ, আর এই। বড় দারোগা বলছিল, এম. এল. এ. না এলেও নাকি ছাড়া পেত মোহনরা। তবে আপাততঃ নাকি মাপাজোকা বন্ধ। ধান উঠলে তারপর। তার মানে বিপদ কাটলো না শুধু পেছিয়ে গেল। মদন দাস মোহনকে সাইকেল চাপিয়ে নিয়ে আসছিল। পিছনে অন্য দুজন রতন আর গোকুলকে। কাল কিছু খেতে দেয়নি আজ বেলা দশটার সময় চারটে রুটি আর বাঁধাকপির তরকারি। আরও রুটির দরকার ছিল, মোহন চাইতে পারেনি। বলরামবাটী ষ্টেশনে এসে মুচিবারিকের দোকানে মাংসরুটি খাওয়ালো মদন। মোহন তিনটে পাউরুটী খেলো। তারপর চা খেতে খেতে মদনকে প্রশ্ন করলো—'তুই কাল ধরা পড়লি না কেন'? মদন উত্তর না দিয়ে হাসলো। আবার মোহন বললো 'কি রে জবাব দিচ্ছিস না যে' মদন ধমক লাগায়, 'থামতো, তোমাদের ছাড়াতো কোন শালা, তোমার ভাই তো কাল রাত্তিরেই এসেচে, তো সে কি তোমায় ছাড়াতে গেলো না এই মদন দাস'? 'কাল এসেচে, তবু এলো না' কথাগুলো বিড়বিড় করে মোহন। মদন শব্দ করে হাসলো, 'তবে। দেখো না কেমন করে তোমার জমির ওপর ইট পড়ে দেখচি একবার, এবার পার্টি লড়বে।

হঁ।। পার্টি, পার্টি তো তোমাদের জন্যেই, মানুষের যদি ভাল করতে না পারলুম, তো পার্টি কীসের, নেতা কীসের'? মোহন কথা বলে না। ভালো লাগে না। বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই ওর ভয় ভয় করতে লাগলো। ভয় ভাইকে। কী বলবে কী জানি। এ বংশে জন্মে কেউ জেল-কোর্ট করেনি। এই কালো দাগ মোহনই পরিয়ে দিলো। গ্রামে ঢুকেই মুখটা নামিয়ে রাখে মোহন। হাঁক ডাক করতে থাকে মদন দাস। সকলেই এগিয়ে আসে মোহনের দিকে, সাইকেলে বসে বসে পাছাটা টনটন করছে, নেমে যায়। হাঁটতে থাকে। 'মেরেনে তো গো' 'মামলা কি করলো নিয়ে গিয়ে' 'কোর্ট কাছারি চলবে নাকি' 'তা, তুমি বাপু লাঠি চালাতে গেলে কেন' এরকম নানান কথাবার্তা ওর কানে ঢুকতে লাগলো। মোহন মিশে যাচ্ছিল মাটিতে। ওর মোটেই এসব পছন্দ হচ্ছে না। কে একজন বল্লে 'জমি-জিরেত যদি রক্ষে পায়তো ঠাকুর, তোমার জন্যেই পাবে সেকালে বটে'। পিছন ফিরে দেখে নেয়, লোকটাকে, কথাটা ওকে আরাম দিচ্ছে, বৌমা বেরুবার সময়েই বারণ করেছিল,—'বাঁশটা নিয়ে যাচ্ছেন কেন, ওটা রেখে যান' বৌমার কথা শুনলে আর এ ঝামেলা পোয়াতে হোত না।

২১. নিরু ওর ঘরে ঢুকলো না একবারো। বৌমা খেতে দিয়েছে। খেয়েছে। আঁচানোর সময় হাতে ঘটি ধরে বৌমা জানালো—আজ বিকেলে ওরা চলে যাবে। নিরু রেগে আছে ওর ওপর। থাকুক। কৈ ভায়ের ওপর রাগটাই হয়,—দরদ? একবার যেতে পারলি না থানায়। ঐ বোঁচানাকী মদনা না থাকলে কি আর ছাড়া পেত মোহন। রাগের মাথায় হড়বড় করে একটা কাজ করে ফেলেছে। সত্যি সত্যিই ও লাঠিটা

ছুঁড়ে মারবে ভাবেনি। মাথায় লাগলে রক্তারক্তি হলে কি আর এত সহজে ছাড়া পেতো। ভাবতে ভয় পায় মোহন। বৌমা অবিশ্যি বলেছে, 'আমার কিন্তু খারাপ লাগেনি, আপনি ঠিকই করেছেন'। তখন বৌমার মুখের দিকে তাকিয়েছে, আন্তরিকভাবেই বলেছে বৌমা, একটুও বাড়াবাড়ি নয়। বৌমারা চলে যাবে। তবু এ'কটা দিন যত্ন আত্তি যা পেয়েছে তা ভাগ্যিই। বৌমার গ্রামের ওপর টান আছে ঠিকই, তো বাঁদরের নেই. ছেলেমেয়ে দুটোও সেইরকম-শেষ কটা দিন যা ঘোরাফেরা করেছে। সাবিত্রীর কথা ভাবে মোহন। আজ এখানে থাকলে ও কী করতো। থানা ফেরত মোহনকে নিশ্চয়ই অপছেন্দা করতো না। হাজার হোক স্বামী তো। হয়তো করতো—সাবিত্রীকে কোনদিনই বোঝেনি মোহন। এবার একটু গড়িয়ে নেবে কী না ভাবে। এমন সময় ঘরে ঢোকে রিনি। 'জ্যাঠামশাই'—'আয়, বোস'—'তোমায় কি ওরা টরচার করেছে'? 'কি'? 'ওরা মারধোর করেছে নাকি'? 'না'। 'তুমি হঠাৎ লাঠি ছুঁড়লে কেন, কই আরও তো লোক ছিল, ওরা কেউতো মারেনি'? 'ওরা ছুঁচো'—হেসে ফেলে রিনি। পাশে বসে। বাঁ-কনুইটা সরিয়ে নেয় মোহন। ব্যথা খুবই। মেয়েটা ধরে ফেললেও ধরতে পারে। 'আর যেন এরকম মাথা গরম কোর না, যদি কোনো কিছু হতো, কী হোত বল দেখি'? মোহন আনমনে বলে—'না মা, আর এরকম হবে না'। আবার হাসে রিনি। জ্যাঠামশাইয়ের গায়ে হাত রাখে। 'একটা আয়না চিরুনী রেখে যাচ্ছি, চান করে রোজ মাথায় চিরুনী দিও। আর মাঝে মাঝে নাপিতকে দিয়ে এই খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলো কেটো'। 'কেন রে, আমি কি আপিস যাচ্ছি নাকি'। 'না,—কেটো,—খুব খারাপ লাগে দেখতে'। 'দেখতে'—মোহন হেসে ফেলে। শুধু শব্দ হয় না।

রিনি উঠে যায়। মিনিট কুড়ি পঁচিশ পর আবার ঢুকলো ডাব্বুর সঙ্গে। ওরা চলে যাচ্ছে। বাইরে বেরুনো উচিত ওর। তবু বেরুবে না। বেরুলেই নিরুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। ও যখন একবারও দেখা করতে এল না, তখন দেখা না হওয়াই ভালো। বৌমা ঢোকে। মোহন খাট থেকে নামে। একটু দূরত্ব রেখে প্রণাম করে বৌমা। বালিশের পাশে রাখে তিনটে দশ টাকার নোট। মোহন কথা বলে না। ঘোমটা বাঁ হাতে আরো একটু টেনে বলে, 'আবার আপনি একা হয়ে যাবেন, আমাদেরও যেতে ইচ্ছে করছে না, তবে ওর খাওয়া-দাওয়ার খুব অসুবিধে হচ্ছে—তাই, আর আপনার খারাপ লাগলে দুএকদিনের জন্যেও না হয় চলে আসবেন কলকাতায়। আপনি তো অনেকদিন যাননি'। ভালো করে দেখে বৌমাকে। মুখে অল্প অল্প কুঞ্চন এসেছে, দু'একটা সামনের চুল যেন পাকা ঠেকলো, শুধু চোখ দুটো তেমনিই আছে। ভাসাভাসা। নিরুর বিয়ের জন্য মেয়ে দেখতে মোহনই গিসলো। আর এই দুটো চোখই তাকে আকর্ষণ করেছে এ বাড়ির বউ করার জন্য ঐ মেয়েকেই। পিছন ফিরতে ফিরতে একপলক দেখে নিয়ে বৌমা বলে— 'না হয় একবার যান না লিলুয়ায়। দিদিকে বলে করে না হয়—' তারপর তরতর পার হয়ে গেল ঘর। ডাব্বু হাঁক মারে বাইরে থেকে 'যাচ্ছি জ্যাঠামশাই'। মোহন ঘরেই বসে থাকে।

২২. আকাশ ফর্সা। টিনের ফুটোটা দিয়ে ফর্সা আকাশ দেখে মোহন, বিছানা ছাড়ে। মুখে চোখে জল পড়লো কি পড়লো না তাড়াহুড়ো। কপাটটা খুলে বাঁশবনের এপার থেকে হাঁকলো 'যতীন রই'। যতীন সাড়া দিল। আর একবার হাঁকলো—'নিয়ে আয়'। যতীন উত্তর দেয়

'যাই গো ঠাকুরমশায়'। আজ আর তাড়ি গিলতে কোন বাধা নেই। যতে চারটে ফুলুরি নিয়ে আসে সঙ্গে। গোলঘরে বসে ওরা দুজনে নিঃশব্দে তাড়ি খেতে থাকে। থানা থেকে ফেরার পরেই যতে যেন একটু বেশী মান্যি করছে মোহনকে। মোহনের এটা ভাল লাগে। যতে কিছুক্ষণ পর উবু হয়ে বসে দুলতে লাগে। নেশা হলে ওর দোলন পায়। দুলতে দুলতে বলে, 'দেকালে বটে ঠাকুর বাপের ব্যাটা বটে'। মোহন অন্যদিকে চেয়ে হাসে। হঠাৎ বিষম খেয়ে কাশতে লাগে মোহন, কাশির বেগে ঘরের কোণে মাকড়সার জালগুলো দুলতে থাকে। জট পাকিয়ে যায়। কাশি থামতে যতেকে বলে 'তোর আজ ভাত হবে'? 'হবে'? 'কখন'—'চাপিয়েছে দেকে এনু' তারপর বয়েসয়ে বলে 'কেন গো', 'আমায় দুমুঠো দিতে পারবি'! 'পারবো'। 'তোর বউ'। 'কিছু বলবে না'। 'পারলে একটু কিছু সঙ্গে দিস, নাহোক দুটো লংকা'। 'হবে গো হবে, তোমায় ভাবতে হবেনে। কিন্তু, কেনো বল দিকি সাত তাড়াতাড়ি চললে কোতায়' মোহন উত্তর দেবে কিনা ভাবে তারপর বাঁ হাতে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে মাটির মেঝেতে তিনটে অক্ষর লেখে, লিখে যতেকে বলে 'কি লিকনু বলদিকি' যতে ঠোঁট চেপে উত্তর দেয় 'আমি কি পড়তে পারি' মোহন বাঁহাত দিয়ে সাবিত্রী শব্দটাকে মুছে তাকিয়ে থাকে গোরুর ডাবার দিকে। ডাবাটা ফেটে গেছে, জল গড়িয়ে গড়িয়ে যায়গাটাকে কাদাটে করে তুলেছে, এতক্ষণ মোহন ভাবছিল ওটা গরুর মুতের কাদা। যতে সেই রকম পুরনোচালে দুলতে দুলতে জিজ্ঞেস করে, 'কিগো বললে না, কোতায় যাবে', মোহন খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বোলায়, একবার বাঁ পায়ের গুঁপো থেকে অল্প মাটি সরিয়ে নোখ দিয়ে জায়গাটা চেঁছে নেয়, তারপর চোখের পাতা ফেলে দিয়ে বললো 'বলবো না'।

ব্রহ্মসঙ্গীত
ব্রহ্মসঙ্গীত
ব্রহ্মসঙ্গীত
ব্রহ্মসঙ্গীত
ব্রহ্মসঙ্গীত

১. ঘরটা ছহাত বাই ছহাত, লম্বা দুমানুষ। একমানুষেরও ওপর ছোট্ট এইটুকুন জানলা, জানলায় মোটা মোটা পাঁচটা শিক। ঐ শিকের ভিতর দিয়ে যে আলোটা আসতো সেটুকু ছাড়া অন্য কোন সঙ্গী ছিলনা, যেহেতু পূবালো জানলা, অল্প সূর্যালোক জানলার শিকে আটকা খেয়ে ঘরে ঢুকতো, অমিতাভ বুঝতো সকাল। সময়টা ঠিক বুঝতো না। সারারাত এই আলোটার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কাজ ছিল না, বাস করাটা খুব দীর্ঘ নয়। তিনদিন। এখানে প্রথম বেলাটা কাটাতে গিয়েই বুঝেছিল কেন মানুষ খোঁয়াড়া সেলে থেকে থেকে রুগ্ন এবং অন্ধ হয়ে যায়। প্রথম দিন প্রায়-সন্ধ্যেবেলা সেলে ঢুকলো অমিতাভ। গোটাকুড়ি থামওলা টানা ঘরের শেষে গিয়ে থামলো দুজন কনেষ্টবল। একজন লোহার বালা খুলে দিল হাত থেকে। অন্যজন তৎক্ষণ হড হড করে ক্রুশচিহ্ন মার্কা গোটা ঃাষ্টেক রডওলা দরজা টেনে পথ করে দিল, এগিয়ে দিল লণ্ঠন, তোবড়ানো ঘটিতে জল। লণ্ঠনটা দুঘন্টাটাক জ্বলেছিল। বাচ্চা ছেলের তরল মলের মতো ডাল, দুটো শুকনো রুটি, পোড়া। একটি লম্বা লঙ্কা, ভাজা। তেলে। রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়তে নিদেশ দিয়ে চলে গেল ওরা। ঘরে পাতা আছে আঁশওলা তেল চিটচিটে ছেঁড়া কম্বল, মাথার পাশে আর একটা কম্বল, পরিষ্কার, এবং আর একটু মোটা। গায়ে খদ্দরের চাদর, পাজামা, পাঞ্জাবী, ঝোলাব্যাগ। ঝোলাব্যাগে একটা জামা, একটা পাজামা, একটা গামছা এবং মাজন, ব্যস্। আমাদের ভারতবর্ষের একটি রাজ্যের জেলাকোর্ট অর্ডার দিয়েছে এই বাসস্থানের, নিদেশমত জেলার সাহেব সুবন্দোবস্তের সঙ্গে, কলম বন্ধ করে হাই তুলে বললেন, 'যান, অসুবিধে হলে বলবেন'। অসুবিধে? অসুবিধে কিসের! ঘরের বাঁ কোনে একটা ডাবা, পরিষ্কার

করাই তবে অল্প আগের পূর্ব আসামীটির পেটের ভিতরের বাণী ছিটোনো, নাক বুজিয়ে দেয়া গন্ধ, বালতিতে আধবালতি জল, নো পাত্র। অসুবিধে কিসের ? আর চার হাত দূরেই রাতের খাবার। একজন হাজতবাসীর। আসামীর। কোর্ট যাকে সন্দেহ করে। সরকারী উকীল যাকে উপদ্রুত ভাবে, অতএব 'তাহার ভিতরে থাকাই উচিত' এবং এই রকম ভিতরে ! কোর্ট তাকে 'আসামী' প্রতিপন্ন করতেই পারে কারণ দেশের ত্রাণ-কর্তাদের সেনাবাহিনী 'তার বিরুদ্ধে যে যে কাগজ দাখিল করেছে তাতে লেখা আছে, 'হাতে ছিল স্টেনগান, রিভলবার, ব্যাগে বোমা, ছুরি'। পুলিশ তার বিরুদ্ধে গুলি চালায়নি তবু সেই ছেলেটির হাতে অস্ত্রশস্ত্র কথাও বলেছিল, যদিও সৌভাগ্যবশতঃ কেউ আহত হয়নি আসলে যেন অন্য কোন সাধারণ মানুষ হলেই আহত হবার ভয় ছিল কিন্তু বঙ্গপুলিশ বলেই সুকৌশলে গোপন নিয়ন্ত্রণে তাদের প্রাণ শক্তি মস্তক রক্ষিত রাখতে সক্ষম হয়েছিল। সমাজবিরোধী। এ্যাটেম্পট। মার্ডার। চালাও নিশী। তিনশো চৌত্রিশ। লে হালুয়া—তোর ফাইলে। শালাকে দে বাপের নাম খগেন করে ইয়া ত ফাঁক। অন্দরমে, সেলকো ভিতর। একদম ভিতর। একেলী। বোঝ, ঠ্যালা বোঝ। আর লিখবে সেই মারাত্মক কাগজটায়, 'মহাশয়ের দেশ,' দেশের কথা, শালা দেশ ঝাড়ছিলে। নাও এবার চোদ্দপুরুষের দেশ দেখো। শালা, বীরভূমের সিউড়ী হচ্ছিল, বোঝ, লাও সিউড়ী, খাও মোরব্বা। পুরন্দরপুর, পাতন্দা, শ্যামসুন্দর—পাঁশকুড়া, হরিশ নগর, আগুনেশ্বর। নাও—লেখো, কত লিখবে লেখো, গোপন কাগজটির গনগনে পাতা যেখানেই উড়ে পড়তো সেখানেই মাটির ভিতর যেতো ঢুকে, সঙ্গে সঙ্গে পড়পড় করে গজাতো ঐ কাগজের ঔরসে এক একটা গাছ। পাতা ঝরে পড়তো মাটিতে, পাতা পড়েই বনে যেতো মানুষ, গাঁয়ের কালো কালো

মানুষ. নাও, বলো, এবার লেখো ওদের মুখের কথা। কেমন হল, গোডায় জড়ুম। রাত হয়ে গেল যে কখন, কখন যে শিকটার ওপর আলো এলো আর কখন যে লম্বা ছায়া একটু একটু লম্বা হয়ে গেল—হঠাৎ ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ। খুলে গেল দরজা, একজন পোষাক পরা জেলের লোক তাকে নিয়ে গেল বাইরে। সেলের বাইরে। অন্ধকারের বাইরে। সামনে খোলা জায়গা। পুকুর, গাছপালা, পাখী, জেলের পাঁচিল টপকে লম্বা একটা তালগাছ, ডাঁয়ে বাঁয়ে লম্বা লম্বা ঘর। তা থেকে মানুষ বেরিয়ে আসছে গুড গুড করে। একি রে! সব মুক্তি দেবে নাকি! এখন? না, ফাইল। সারি বেঁধে মুখোমুখি দুটি লাইন। দুজন পোষাক পরা লোক (জেলের লোকগুলোরও অবশ্যি ডেজিগনেশন আছে, কিন্তু মনে পড়ছে না, কী যেন বলে, হয়তো জমাদার) গুনে যায় দো, চার, ছে, আট, দশ। গুনে নিল নস থেকে চুল। হাঁ ঠিক হ্য 'চলো লাইনসে'। কোথায়। পুকুরের উল্টোদিকে ঘোড়ার জল খাওয়ার মত একটা চওড়া জায়গা, মাটিতে বসে থালা ধরে সার বেঁধে পরপর নিতে হ'ল দুটো রুটি, ছোলা ভাজা। টিফিন। রাতের খাবার পড়ে থাকায় অমিতাভকে টিফিন করতেই হ'ল। তার পারছিলও না। কাল কোর্টের বাইরে দুটো লুচি আর ডাল। কিবে খেয়ে ছিলই। খাবারের চেহারা দেখে মুখে তুলতে পারে না। আজ পার তা মনে হোল না। নির্বিচারে খেয়ে দেয়ে জল খেল একপেট। ঘুম পেয়েছে খুব। একটা বয়স্ক গোফন্দ বিহান চেহারার জমাদারের সঙ্গে সঙ্গে ও সেলে চলে গেল। গিয়েই টানা ঘুম। তিন দিনের দিন জেলর তাকে ডেকে একটা লম্বা ঘরে, অনেক চোর ডাকাত, ধর্ষণকারী এবং খুনীদের পাশে জায়গা করে দিল। এতেই সে জেলরের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে পড়লো। সে কৃতজ্ঞতা আরও বাড়লো

এখন জেলর তার অফিসে ডাকলো ওকে। গিয়ে দেখে ন-কাকীমা আর ন-কাকা। জেলর ঈশ্বরের মতো আশীর্বাণী করলো—'খাও খেয়ে নাও, বাড়ীর খাবার আজ থেকে এ্যালাউ করলাম'। অমিতাভ লোভী মানুষের মতো 'চিংড়ির কারি আর ভাত গিলতে লাগলো। ন-কাকীমাকে ও ন মা ডাকে। ন মা হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলতেই অমিতাভর ভিতরটা নড়ে গেলো। চোখে জল নামলো। প্রপাতের মত। ন-কাকা কঠিন মানুষ একটু দূরে সরে গেলেন ওদের কাঁদতে দিয়ে। অমিতাভর পরে কোন শাস্তি হয় না। তবু তাকে বাংলা দেশের বাইরে 'বেনিফিট অব ডাউটে' একজন পুলিশ অফিসারের বাড়ীতে থাকতে হয়। কোন প্রমাণ না পেয়েও সন্দেহ নিরশন হয় নি। হয় না। এই ফুলসাজ অনেককেই পরতে হয়েছে, চিবুকে বেয়নেটের চাপে যে দাগটি স্পষ্ট, আজ তাও 'বেনিফিট অব ডাউট' ঘাড়ের জয়েন্টে যে ভাঙ্গা হাড়কটা একজায়গায় কোনরকমে জড়াজাড়ি করে শুয়ে আছে,—তা পরে অমিতাভর হাতে তুলে দিতে পারে স্পনডিলাইটিস। ফলে সেটাও 'বেনিফিট অব ডাউট'। জেল খাটা আসামীর জন্য অবশ্য গিরি একটি মেয়ে অন্য গৃহে চলে গেছে কারণ 'বেনিফিট অব ডাউট'—সন্দেহ কার মেয়েটির বাবার, না মেয়েটির? অমিতাভ জানে না। সরকারী চাকরীর যোগ্যতা তার সেই 'বেনিফিট অব...'। তার বিরুদ্ধে আইনানুগ কোন প্রমাণই পাওয়া যায়নি যা থেকে শাস্তির ছবি বৃহৎ হতে পারে। কিন্তু সংবিধানে 'বেনিফিট অব ডাউট' কথাটি লেখা আছে, সেই লেখাটিকে সম্মানিত করার জন্য কিছু মানুষের জন্ম হয়েছিল এই বঙ্গদেশে, অনেককেই বাংলা-বিহার উড়িষ্যা ভারতবর্ষ এমনকি পৃথিবী থেকেই বিদায় নিতে হয়েছে, ওরা সবাই, সকলেই সেলাম জানিয়ে গেছে এই 'বেনিফিট অব ডাউট'কে। লাখো সেলাম।

২. অমিতাভ একটা ক্যাপস্টান ধরায়। পুরনো কথা চিন্তা করতে ওর ভালো লাগে না। এখন, কলকাতা সংলগ্ন এই বাড়ীটাকে মাঝে মাঝেই ওর জেলখানা মনে হয়। কারণ নেই। শুধু একটি মাত্র উঁচু জানলাই কি ওকে মনে পড়ায়। জানলা পার হয়ে জামগাছ,—ওপারে একটি বাড়ী, পাকা, চালটা টালির—ডানদিকে পুকুর। বাঁদিকে পাড়ার রাস্তা—চলে গেছে বাসস্ট্যাণ্ডে। ঘরের ভিতর ফাঁসিকাঠে লটকাবার ঠিক আগে প্রেমিকার সামনে মানুষের উদ্দেশে গীতরত সায়েৎজার দু'হাত দু'পাশে সীগলের মতো ছড়িয়ে। এটা ছবি, তার উপরে পিকাশোর প্রিন্টেড ছবি মা। নীচে সুইজারল্যাণ্ডের বরফপড়ার ছবি, আর একটা ছবি আছে আঁকা, এক বন্ধুর শ্যালিকার, বন্ধ্যাব। কালারিং ভালো লাগায় দেয়ালে সে টেঙে রেখে দিয়েছে। অনেকে দেখে, কেউ অনেকক্ষণ, কেউ ক্ষণেক, কারো খুব ভালো লাগে, কেউ বলে—'ভালই তো'। তৃণা শুধু হেসেছিল ভীষণ। হা হা করে। এমনিই একটু ও বেশী হাসে। কারণে অকারণে, কিন্তু এ ছবিগুলো দেখতে না দেখতেই—'ওমা—এ কী করেছো-' হেসেছিল অনেকক্ষণ। অমিতাভর একটু লেগেছিল। নীচটা সব সময় ভিজে ভিজে, ওপরটাও কিছুটা, এর চেয়ে অচিন্ত্য মাইতির মেস ছিল ঢের ভালো। অন্ততঃ স্বাস্থ্যের পক্ষে। কিংবা প্রায় নিয়মিত খাওয়া দাওয়ার পক্ষে, কালীমন্দিরে যাবার রাস্তাটা অমিতাভর যেন জন্মজন্মান্তরের চেনা। কত পুরুষ ধরে যেন বাস করতো অমিতাভ। মেসপালক অচিন্ত্যবাবু মোটা, ফরসা, বাড়ী দীঘা। মাসে মাসেই ওর বৌ-এর জন্য মন কেমোন করতো, এবং হুটহাট চলে যেত, ফেরার তারিখ প্রায়ই পার হয়ে যেত এবং প্রতিটিবারই ও সংসারের কাজের অজুহাত পাড়তো। দিলীপদা বিয়ে করে বাঁশদ্রোণী চলে গেলো। ঐ ঘরে দিলীপদাই ছিল ওর খুব কাছের লোক।

মিষ্টি স্বভাবের এ মানুষটির ছায়া অমিতাভ বোধ করতো খুব। একজন ব্যায়ামবীর ছিলো, খাওয়া এবং বড় বড় নাকসিটকানো কথা ছাড়া কিছুই জানতো না—নর্থ বেঙ্গলের ছেলে, ঈর্ষাকাতর এবং মিথ্যুক। অমিতাভ ওকে এড়িয়ে চলতো। মেসে কারো বান্ধবী এলে ব্যায়ামবীরের কাজ পড়ে যেতো ধরে, খুব।—ভালই ছিল মেসের খাওয়া কোথায়ই বা ভালো হয়, তবু ওর মনে হোত একটা সংসারের ভিতর বাস করছে। এই সেন্টিমেন্টটা ওকে খুব ভোগাতো। দিলীপদাকে ও দাদাভাই ডাকতো, বিয়ে করে চলে যাবার দিনটি ওর মনে খুব দাগ কেটেছিল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রায় প্রেমিকার মতো দাদাভাইকে ভেবেছিল। দাক্ষ দাদাভাই বাবা। ছবিবৌদিও ওর একই ডিপার্টমেন্টের-ডি. এস্ তি। মেয়েটি দাদাভাই এর জন্য ঘর ছেড়ে ছিল। ছবিবৌদির এই ঘর ছেড়ে আসাটাই অমিতাভকে খুব লাগে। মাঝে মাঝে তৃণা আসতো ঘরে। কোন কোন সময় বান্ধবীকে নিয়ে। অমিতাভর মনে সূক্ষ্ম একটা ইচ্ছে ছিল সানদা কিংবা সমরেব সঙ্গে যদি পরে কমা মানে তৃণার বান্ধবীর বিয়েটা দেয়া যায়, সানদাকে খুব ভালো বুঝতে পারে না অমিতাভ। কোথাও ওর একটা সুতো বাঁধা আছে। খুব দামী সুতো। তীব্র টান টান আটকে, সে কেমন? সে মেয়েটি আজ জননী হয়ত বা, খুব কষ্ট পেয়েছে একা, মনে মনে, খুব। এই সান্দা ওর জীবনে একটা উড়ন্ত গহ—ঝড়ের মতো আসে, ঝড়ের মতো যায়, এরই মাঝে কি করে যেন সে লেখালেখির মহলে চলে যায়। এই চলে যাওয়াটা বোধহয় একান্ত সানদারই জন বাধা করেছে লিখতে, দিনের পর দিন বকুনির ঠেলায় চোখে জল এনে দিয়েছে, অথচ সূক্ষ্ম এবং মোহন জায়গাটি রেখে দিয়েছে অমিতাভের জন্য। এ জায়গা আজ পর্যন্ত কেউ দেয়নি। কেউ না। এ চরিত্র দিনের পর দিন সে অর্জন করেছে

পর্যান্ত এক সাহিত্যিকের কাছে ... কাদার অ্যা বাইটাস। দিনের পর দিন তাঁর গল্পে কেটে গেছে তাদের—অমিতাভর মনে এক গোপন কষ্ট, সেই বিমলদার কাছে কেন দিন পাওয়া হয়নি। কোনদিন না। এরই মধ্যে চাকরীর জন্য তাকে একবার দ্বারভাঙ্গা চলে যেতে হয়, উনিশ দিন পরই ফিরে আসে। কলকাতায়ও একটা স্কুলে চাকরী করে। তবু বাইরের টান অমিতাভর ভিতরের টান, এর ডাক ও মর্মে-মর্মে বোঝে, নাহলে রমেনদাকে ছুটান যাওয়ার পথে শেয়ালদায় সী অফ করতে গিয়ে ও ওঁর সঙ্গে চলে যেতে পারতো না। গোপাদি অবাক বিস্ময়ে ওর চলন্ত ট্রেনে যাওয়া দেখে ছিলেন অন্যান্যরা ভেবেছিলেন পরের কোথাও নেমে পড়বে। শুধু রমেনদাই জানতেন ও ছুটান পর্যন্তই যাবে। আজ এই কোন রকমে গোরুর-গাড়ির কাঁচ কোঁচ টানা সময়ের কাছে অমিতাভর বড় অসহায় মনে হয়। কত কী করার ছিল কিছু হ'ল না, হবে কী?

... সেল থেকে হাজতে ... জেল হাজত ... কয়েকজন রাজনৈতিক দুস্থ-মনের ছেলে ত্রিশ চল্লিশটা বিপ্লবী আসামীর সঙ্গে সহাবস্থান করছে পঞ্চানন দাস। রেলের তার কাটতে গিয়ে ধরা পড়েছে। পুলিশের গুলিতে মর কিছু হয়নি, ওর গুলিতে পুলিশ ধরাশায়ী ... দিয়াড়া শেওড়াফুলীর মাঝ মাঠে টানা চারমাইল ছুটতে ছুটতে অবশেষে ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। ঘরে মা, বাবার প্যারালিসিস, তিনটে বোন, একটা দিদি ছিল—শেওড়াফুলীর মাসীদের পাড়ায় ওর দেখা পাওয়া যাবে। কুমারী দিদির ছেলে মানুষ করছে পঞ্চানন। নাইন পর্যন্ত পড়েছে। তারপর মদ চোলাই। তারপর স্মাগলিং। তারপর ডাকাতি। বড় বিস্ক। তাই তারকাটা। এতে ডবল লাভ—মহাজনের কাজ মহাজনের টাকা, মাঝে মাল সরাতে পারলে

তার টাকা, টাকার করাত। যেতে টাকা, আসতে টাকা। দু'বিঘে শালী জমি কিনেছে, পাশে ক্যানেল। আর ভাই নেই, বন্ধু অনন্ত, ধরা পড়েনি। ও আসে। মাঝে মাঝেই আসে, কোনদিন ফল নিয়ে, দুধ নিয়ে, মাঝে মধ্যে ভাতও। কোন কোনদিন ছোটবোনও সঙ্গে আসে 'তিনি', পদ্মা জেল থেকে বেরুলেই ওরা বিয়ে করবে। অনন্তই এখন জমি দেখাশোনা করে। পদ্মার চেয়ে ফসলের ব্যাপারটা অনন্তই বোঝে ভালো। নভেম্বরের শেষ, ধান উঠবে। আই. আর. এইট মোটা, তবে বাড়ীর খাবার হিসেবে ব্যবহারে লাভ খরচ কম মানে ধানী ব্যয়। পাঁচ ফুট ছ'ইঞ্চি। টানা চোখ। কালো ব' দাড়ি গোঁফে ভর্তি। বা হাতে ব্যাণ্ডেজ। পুলিশী পাঁদানী। সেই পদ্মা অমিতাভর কেমন খুব কাছাকাছি থাকতো। ইয়াকুব প্রত্যেক সন্ধ্যেবেলা গুনতির পরেই তার প্রিয় গানটি ধরতো 'বড়ী জিন্দগানী হ্যায়—মেরে মেহেবুবা—'। অমিতাভ ওদের গান শেষ হবার পর প্রত্যেক সন্ধ্যায় একা চোখ বুজে মন্ত্রোচ্চারণের মতো গাইতো—'উই শ্যাল ওভারকাম'—গানটা শেষ হলেই ওর মনে পড়তো, গুয়েভেরার কথা। কোন মানে হয় না। শুধু মনের চাপা যোগাযোগ বোধের জন্যই হয়তো। নইলে আর কি। ইয়াকুব গানটা শিখেছিল। ও যখন গাইতো তখন মনে হোত আঃ, এবার জেলটা ভেঙে পড়ুক। হল্লার জন্য একজন বুড়ো জমাদার ইয়াকুবকে গান থামাতে বলেছিল, দিয়েছিল গালাগাল। ইয়াকুব জেল থেকে বেরিয়ে ওর টেংরি মিশিয়ে গোস্ত খাবে, এই ধরণের মন্তব্য করে হাজার গুণ চড়ায় গান ধরলো—'উই শ্যাল ওভারকাম'। সঙ্গে সঙ্গে গোটা কুড়ি ছেলের কণ্ঠ ওকে অনুসরণ করলো। এবং গানের শব্দে জেলার-ও ছুটে এলো। খুব ভয় পেয়ে দু'জন বন্দুকওলা সিপাহীর সঙ্গে দরজার সামনে দাঁড়ালো, স্থানুবৎ। ইয়াকুব—ডোন্ট কেয়ার. অমিতাভরা

ক'জন উঠে গিয়ে ইয়াকুবের পাশে বসে গলা মেলায়—'উই শ্যাল '।
গান শেষ হলে, খুব কড়া গলায় জলব বললো—'চে কী সগ্ গে গেলেও '।
তারপর অমিতাভদের বেবুরকম বিষয়ক অশ্লীল বিস্তি অমিতাভ ইয়াকুবের কাছ থেকে একটা খুব দামী জিনিষ চাইলো বিড়ি। ইয়াকুব গলে গিয়ে বিড়ি দিল। এটা ও কাউকেই দিত না। বন্দী ঘরে এর অপেক্ষা কোন কিছুই দামী নয় অমিতাভ স্পষ্ট দেখেছিল বিড়ির আগুনে ইয়াকুবের চোখে জল। ও আস্তে ধরে পান ক'রে রাখে —লুঙ্গীটা পাট করে রাখা, একটা সাবান। মাথায় টুপী, ও হঠাৎ বললো – অমিত এখন আমি নামাজ পড়বো, একটু নামাজ পড়ে দাও ও ফিরে এসে খবরের কাগজটা খুললো—অমিতাভকে পুলিশ ধরতে সক্ষম হয়েছে, তার খবর। এই পানা চার মাস, তারপর পুলিশী চোখের আওতায় পাঁচ ছটা মাস—কাকে অর্পণ করলো, আর কেনই বা? কি দোষ করেছিল। কি করে সে ভিনেশো ডু-বে আসামী? গোটা ভারতবর্ষ যেন নাচতে নাচতে আদালতে চলেছে—তার শাস্তি বিধানের জন্য। কোন কথা অমিতাভকে কোনদিন মাপ করতে পারেনি। কিন্তু অন্যায় ভাবে একি কষ্টের হিমালয় তার জন্য নেমে এলো, কোত্থেকে?

ও অনেকদিন পর শুভর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। নিউ এম্পায়ারের তলায়। কতদিন পর কতদিন ওরা সিনেমা গেলো, খাওয়া দাওয়া করলো। শুভ উল্টোডাঙ্গার বাড়াতে নেই, দাদার আশ্রয় তার কাছে শূন্য। এক বন্ধুর বাড়াতে কোনরকমে। অমিতাভ ওকে বুকের কাছাকাছি টেনে নিতে চাইলো, এইতো স্কুলের ক'টা টাকা। কি হবে। ভাবলো না। কিছুদিন পরেই শুভ এসে একটা প্যাকেট নিয়ে অমিতাভর কাছে।

অমিতাভ মনে মনে এতো খুশী হোল। বন্ধুর জন্য ওর ভিতরে যে জায়গাটা ফাঁকা ফুটবল মাঠ হয়ে আছে, তা কি কেউ বোঝে, শুভ কিছু-দিন সইলো তারপর যাযাবর চরিত্রটাকে ঠিকঠাক রাখতে অন্যত্র আশ্রয় নিল। সেইদিন রাতে অমিতাভ খুব ভেবেছিল এর কথা। ভুল জেনেও ওর মনে হয়েছিল হয়তো ও ফিরবে বলেই...। এখন ভাবতে গেলে হাসি পায়। জায়গা যদি পায়— যাবে না কেন? ঠিক সেই সময় হঠাৎ তৃণার চিঠি পেলো। তৃণা অক্ষম অমিতাভর কোন জায়গা ওর কাছে নেই। ওকে যেন ভুলে যায় অমিতাভ। আসলে ভালোবাসার পরাজয় হয়েছিল আত্মীয়তার দেয়ালে মাথা কুটে। দেয়ালটা [illegible] অমিতাভ। অমিতাভ যেমন কোন কিছু চট করে ভুলতে পারে না, ছাড়তে কিন্তু সে পারে। অভিমান তখন ইউক্যালিপ্টাসের মতো লম্বা বেয়ে উঠতো ভিতরে ভিতরে। তৃণা অমিতাভর বাবার মামাতো বোন। কি করে যে সম্পর্কটা হোল। মাঝে মাঝেই যেতো ওদের বাড়ী। আফটার অল আত্মীয়। কিন্তু সব কেমোন গোলমাল হয়ে যায়। অমিতাভ জানতো তৃণার বিয়ে ঠিক আছে অন্য একটা জায়গায়. ভালো ফ্যামিলি. অত্যন্ত ভদ্র একটি যুবকের সঙ্গে চাকরীও করে মোটামুটি, কলকাতায় নিজের বাড়ী তবু আকাশ তাকে টেনে নিয়ে গেছে। অথচ মেয়েদের আকাশও খুব দৃঢ়তায় এড়িয়ে চলতে পারে, আজও। একেবারে মুখের ওপর কোন কিছু না বলতে ওর কোথাও আটকায় না খুব নীরবে সমস্ত কিছু সহ্য করে ফেলার মন্ত্রটা ও খুব সোজা উচ্চারণ করতে পারতো। তৃণার ভঙ্গীটা ছিল একটু অন্য রকমের, তৃণা বোধ হয় সব সময় মনে রাখতো অমিতাভর যা নেই, এই জায়গার দৌর্বল্য অমিতাভর প্রচণ্ড এর ফলে কি যে এক চাপা আহ্বান ওর চোখে জলজল করতো কে জানে। অন্ততঃ অমিতাভর মনে

হোত। তারপর ধীরে ধীরে তৃণা সরে এসেছে ওর কাছে. মাঝে মাঝেই অমিতাভর মনে হোত কী লাভ। কী লাভ। আসলে যে কীসে কী লাভ অমিতাভ তা বুঝতো না কোনকালেই যা মনের ভিতর থেকে চাপ দিত তা করতেই সে ছুটে যেত, যে কোন বাধা টপকেই। আজও। এ চরিত্র তার আর কিছুতেই বদলালো না। তৃণার কিছুদিন আগে জনডিস্ হয়। অমিতাভর মনে হোল সমস্ত জগৎ পরিষ্কার তার পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে। সুতপনকে জিজ্ঞেস করলো জনডিস্ হলে খুব খারাপ ফলাফল কি হতে পারে। সুতপন একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল 'ডেথ, ম্যাক্সিমাম' সুতপন জানতেও পারলো না সে তার এক বন্ধুর ভিতরে কোন ওষুধটা ইনজেক্ট করলো। কিছুদিন আগেই ও তো চলে গেছে, পি. জি.-র গেটে দাঁড়িয়ে সুতপনকে চলে যেতে দিল, কিন্তু তাকিয়ে রইলো সি. আই. বির পাঁচনম্বর জানালায়। খোলা। চৌটো পাল্লাই, জাল, তারপর লোহার রড। তারপর বেড। সেই বেডে একটা গোটা মাস শিরদাঁড়ায় অসহ্য চুরমুশ-পেটা কষ্ট নিয়ে মেয়েটা ছটফট করেছে। ইতাদের মুখটা ভাবতে লাগলো অমিতাভ। এই মিষ্টি বিচ্ছু মেয়েটার কী প্রয়োজন ছিল তার সঙ্গে পরিচিত হবার। যদি চলেই যাবি, হাসপাতালে ভর্তির দিন অমন গলা আঁকড়ে ছিলি কেন? কেন বারবার বলেছিলি, 'আমায় ছুঁয়ে থাক, আমায় ছেড়ে কোথাও যাবে না'। তাতো যায়নি অমিতাভ। সকালে ইস্কুল, বিকেলে কাগজ, সবই তো বিসর্জন দিয়েছিল। ওর কি মনে হচ্ছিল একমাত্র অমিতাভদাই পারে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। আর, সেই মারাত্মক রিলিজ অর্ডারে বাড়ীর পক্ষ থেকে সই করতে হয়েছে তাকেই, সই করতে করতেই সে ভেঙে পড়লো. গাছটা এতক্ষণ ঠিক ছিল, হঠাৎ একটা সই, তাকে কোথায় ঠেলে ফেললো. পৃথিবীর কাছ থেকে সে নিজে

সাক্ষী করে ইস্তাযের মৃত দেহটা নিয়ে গেল। পাশে পুতুল ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল চশমা খুলে চোখ মুছতে মুছতে। নতুন একটা দীর্ঘ সুতোয় অমিতাভ আটকে দিল একটা কাঁচ নাম। ইতি। কেই বা জানতো ইতি এতোটা ভেতরে সূক্ষ্ম কারুকাজ হয়ে আপনমনে ওর কাজ করে যাচ্ছিল নিজের মনে যেমন মগ্ন হয়ে ও পাঞ্জাবি পরতো ঠোঁট উল্টো টিপে টিপ পরতো মাথা নীচু করে পরতো খদ্দর, আর রাগ হলেই মুখ করতো. দাপটে। ইস্তাম সে দাপট তুই কাকে দিয়ে গেলি। আগের রাত্রিরে তৃণাকে নিয়ে দেখে গেছিল ইস্তামকে। মাসীমা হেসে তৃণাকে বললেন 'কী অনেকটা ভালো লাগছে না ওকে—। তৃণা ঘাড় নাড়লো। শুধু বেরিয়ে এসে অমিতাভর কাঁধে গালটা চেপে বলেছিল, 'কিগো, বল না, ও ভালো হবে না ? অমিতাভ সেদিন ওকে কী সান্ত্বনাই দিয়েছিল মিথ্যে কথা বলে। সি আই. বি নরখাদকের মত। অমিতাভর দিকে ছিল তাকিয়ে অমিতাভ অগ্রাহ্য করে এগিয়ে এল সি জি র বাইরে রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে ও এসে দাঁড়ালো ভিক্টোরিয়া আর ফাইন আর্টসের ফাঁকা জমিটায়। গত বছর এখানে বুক ফেয়ার হ'ল। ওরা ও একটা স্টল নিয়ে নিজেদের বই পত্তর বিক্রি করলো। ছবির একশো সাতাশ কপি রাজনৈতিক অরাজনৈতিক বিক্রি হয়ে গেছে অমিতাভ চেঁচিয়ে উঠেছিল 'কোন শালা বলে আমাদের বই বিক্রি হয় না। এই বুক ফেয়ারই তৃণাকে সত্যিকারের নিকট করে দিয়েছিল। ওরা তখন দু'জনে সারা বইমেলা ঘুরেছে আর সাগোলের মত বই ঘেঁটেছে সেই তৃণা অসুস্থ, একদিন একটু খবর নিয়ে চলে গেলো ওর বাড়ি। তৃণা অসুস্থ অবস্থাতেও উঠে বলেছিল, 'তুমি তাড়াতাড়ি চলে যাও'। ওর বৌদি ছাড়া তখন আর কেউই ছিল না। শুকনো ভদ্রতা তাকে আঘাত করলো, কষ্ট দিল না, কারণ ও জানতো তৃণার বাড়ীর দরজা স্বাভাবিকভাবেই

ওর কাছে বন্ধ। সুতরাং। আর কী। তবু থাকতে না পেরেই অমিতাভ চলে গিয়েছিলো। মনে হচ্ছিল যুগ যুগান্ত ওকে দেখেনি কত যুগ। শুকনো মুখটা একটু কালো হয়েছে, চোখের নীচে অল্প কাজল রং। কণ্ঠাছুটো একটু উঁচু, চোখটার ভিতর ও অনেক করে হৃদপিণ্ড খুঁজলো, কালারব্লাইণ্ড অমিতাভ পেলো না হৃদয়ের চিহ্ন। শুধু একটু ঘোলাটে মনে হোল। পাশবালিশের ওপর হেলান দেয়া তৃণাকে মনে হচ্ছিল ক্লান্ত। কিন্তু অসম্ভ এটা মনে বা ভাবতে ভালো লাগছিল না। অমিতাভ খুব গভীর তৃপ্তিতে তৃণাকে একটা চুম খেলো, জিভের ভিতর থেকে তৃণার মুখের জলের স্বাদ পেলো অমিতাভ। তখন অমিতাভর মনে হচ্ছিল তৃণার ভিতরের সমস্ত অসুখ সে এইভাবে টেনে নেবে। তাড়াতাড়ি তৃণা উঠে দাঁড়াক। তৃণার বৌদির হাতের খাবার প্রত্যাখ্যান করলো। খেলো শুধু এক কাপ চা। তৃণা সন্দেশের কোণ থেকে তুলে দিল একটা, ও একটু বদমাইসী করে পুরনো অভ্যাসেই দাঁত দিয়ে ওর ঠোঁটে দিল খানিকটা চাপ তারপর বৌদির সামনেই তৃণা একটা মিথ্যে ভঙ্গী করে ওকে নিজের খাবার, পেপে-সেও খাইয়ে দিল কয়েকটা। 'কি, পেটতো খালি, ভাত খেলে না কেন'? ও আর একবার চুম খেলো তৃণাকে, একসেকেণ্ড মাথা রাখলো তৃণার বুকে। তারপর খুব আস্তে বললো— আমি ঠিক হয়ে যাব, ভেবনা মন খারাপ করে থেকো না।

৫. জেল থেকে বেরিয়ে সোজা গাঁয়ে, একদিনের জন্য। তারপর টানা চার মাস বাইরে থাকতে হয়েছিল। নিরুপায়। ঠাম্মার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই, ঠাম্মা বুকে টেনে কেঁদেছিল, খুব। নতুন কাকীমা বাঁশের খুঁটিটা জড়িয়ে ফোঁপাচ্ছে, ভাইটু তার মাকে জড়িয়ে খুব অবাক হয়ে বড়দাকে দেখছে, নতুনকাকীমার তখন এই একটাই ছেলে, বুম্বা হয়নি,

রানা, মৌ, তাদের বাবা ন-কাকার কাছ থেকে দাদাকে দেখছিল। ঠাম্মা হাত বোলাতে লাগল অমিতাভর থুতনিতে। 'হায়রে এখানটায় কে মেরেছে রে'। মাগো, তোমায় কেমন করে বলি কে মেরেছে, কেন মেরেছে। এটা মা বেয়নেটের খোঁচা। তোমার আদরের নাতির মতো কত ছেলেকেই যে খেতে হয়েছে তা কি করে বলবো বল। তুমি জিজ্ঞেস কোরনা মা, ও কথা জিজ্ঞেস কোর না। ঠাম্মা ওকে একবার ধরে ডাকলো, তারপর চুপিচুপি বললো, 'যা, মা এর ছবিটা প্রণাম করে আয়, ওর জন্যই বেঁচেছিস্'। মুহূর্তে ভিতরে একটা খোড়ো হাওয়ার মধ্যে অমিতাভ মিশে গিয়ে উড়তে লাগলো। বারবার সমুদ্র উপকূলে আছড়ে ফেললো ওকে। নতুন ঘরে ঢুকতে গিয়েই চোখ পড়লো—টেবিলের ওপর। একটাও বই নেই। মানে, প্রিয় বই। বইগুলো চোখে পড়লো না, ওই টেবিলটাই একসময় ওকে ডাকতো, যেন বলতো 'কিগো লিখবে না তোমাদের কথা'। অমিতাভ তো শুধু নিজেদের কথাই লিখেছিল, মহাশয়ের দেশ। মহাশয়ের তা সহ্য হয়নি। বিছানা তুলে তলাটা দেখলো—একটাও নেই। কাগজগুলো পোড়ানো হয়েছে, ছোটকা ওগুলো পুড়িয়ে দিয়েছে। জেঠুবাবু জেলার এক বিশেষ রাজনৈতিক দলের বড় নেতা। তাঁর ভাইপো হয়ে বিপরীত কাজকর্ম যেমন সমর্থন করেনি বাড়ী, তেমনি পুলিশও। পরে সেজকাকা পিঠে হাত রেখে বলেছিল, 'আমি জানতাম আমি জানতাম—এরকম একটা কিছু হবে'।—পরে তাকালো মায়ের দিকে। বহুদিন ধরে এই ছবিটা ঠিক এরকম ভঙ্গীতেই ঝুলছে। মাথায় ঘোমটা, কপালে একটা টিপ, ডান হাত সোজা ফেলা বাঁ হাতের কনুই স্পর্শ করে, সাদাখোলের মোটা পাড়ওলা কাপড়, পেছনে বন-জঙ্গল। ফটোটা নাকি মামার বাড়ীতে তোলা। অমিতাভর মা। জননী। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে দেখলো। মুখে কি একটু হাসির

ছায়া। মা কি এইভাবেই হাসতো, এতো আত্মপ্রসাদের হাসি অমিতাভর মনে হয় হয়তো খুব হালকা করে বলছে, 'আমায় ছেড়ে কেমন আছিস, তুই'—তুমি তো বুঝবে না, আমি যদি তোমার পরলোক অস্তিত্বে বিশ্বাসও করে ফেলি তবুও তুমি শুধুই দেখবে—তাকিয়ে তাকিয়ে, তুমি তো তাকিয়ে তাকিয়েই বোঝ। ঠাম্মা যখন মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, তখন কি কালঘুম আমার নামে! ওটুকুও করার কোন সুযোগ নেই তোমার। আমি তো তোমায় চিনতাম না মা, বুঝতামও না। আমি জানতাম আমার মা তো আছেই,—সুতরাং। শুধু মনে হোত সে-মা যেন কেমন? কই কোলে শুতে দিদি কেন, কই আমায় দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে টেনে নেয়নি কেন, কই আমার গালে গাল দিয়ে কেন বলেনি—'ঘুমো'। বরং—সে কথা থাক। আমার মনে পড়ে—তখন আমি খুব ছোট্ট। খুব। কালো বুট, হাঁটু পর্যন্ত টানা সাদা মোজা। সাদা শার্ট, কালো বেল্ট লাগানো প্যান্টের ভিতর গোঁজা। মোজা ঠিক করতে করতেই একদিন দেখি ন বাবা—তোমার ছবিটা ঝাড়ছে, মুছছে আমি কাকাকে হালকা জিজ্ঞেস করেছিলাম—কে গো? কাকা বলেছিল—'বৌদিদি পর'। আমি বললাম বল না'। 'আমার বন্ধু'—। বন্ধু—ধাং—মেয়েরা বাবার বন্ধু হয়'। কাকা বললো—'হয় মেয়ে বন্ধু'। মেয়েবন্ধু কথাটা সেইদিন আমার জগতে প্রবেশ করলো মেয়েরা মা হয়, জ্যাঠাইমা, কাকীমা, মামীমা, মাসীমা, বোন—দিদি কিংবা ঠাম্মা হয়। খুব মজা লেগেছিল। কয়েক বছর পর আরো কিছুটা বড়ো হতে—কলকাতা থেকে মাসী আসলেই আমি সেঁটে থাকতাম ওর সঙ্গে, তো নতুনকাকা- জিজ্ঞেস করেছিল—ও তোর কে হয় সব সময় পড়ে থাকিস।' আমি খুব শান্ত এবং গম্ভীর গলায় নকাকার মতো বলেছিলাম 'বন্ধু, মেয়ে বন্ধু'। তো সেদিন বুঝিনি তুমিই আমার

মা, সত্যিকারের। তোমারই পেটের ভিতর আমি দশমাস দশ দিন ছিলাম। তোমার রক্তের মধ্যে আমার ছিল বেঁচে ওঠা। অন্য এক জায়গায় তো আমি জানলাম—আসলে আমি তোমারই ভিতরের ফসল। শুনলাম, পুরীতে। সী বীচে। জেঠুবাবুর মুখে। তোমার নাম আভা। তুমি খুব শান্ত। তুমি না? চোখে মাটি দেখতে দেখতে খুব নরম করে কথা বল। তুমি গয়না ভালোবাসো না, তুমি সিঁদুর ভালোবাসো। ওহ্—এগুলো তো পাস্ট টেন্স অতীত। তার সবই তো ছিলে, করতে ইত্যাদি। সময় তাই। আর একজনকে খুব চাপা বলতে শুনেছিলাম— আমায় দেখিয়ে—'হি ইজ দ্য কজ অফ হিজ মাদারস ডেথ'। মানে—সবশেষে তুমি এই উপকার আমার মাথায় পরিয়ে খুব নীরব হাসি হেসে ফেলেছিলে তোমার কুড়ি মিনিটের সন্তানকে দেখে এবং তারও কুড়ি মিনিট পর দুটো চোখ, যে চোখে নারকেল পাতার মতো বাতাস বইতো একদম বন্ধ করে দিলে। ব্যাস্। চ্যাপ্টার ক্লোজ। তারপরে দু বছর ছ'মাস আমি ছিলাম মামারবাড়ী আমার দিদ্মার কাছে। মামারবাড়ী থেকে আমায় আনা হয়নি। কেন মা, জানি, আমি তো অপয়া আমি যে ধুতুরার ফুল গাছ নিয়ে জন্মেছি গো,—তাই না তো, আমার বাড়ীর কেউ কিন্তু এ 'হি ইজ দ্য কজ' উচ্চারণ করেননি, ওরা সবাই—মনে মনে বলেছিলেন—তাঁদের গভীর নীরবতার মধ্যে। অথচ কী আশ্চর্য দেখ এই গুরুজনাদির বাৎসল্যের টইটুম্বুরে হাসতে হাসতে খেলতে খেলতে বড় হয়ে গেলাম, তুমি বোঝার সময়টুকুও পেলে না। তোমায় খুব মনে পড়ে মাঝে মাঝে, যখন খুব একা থাকি, যখন ঘর অন্ধকার হয়ে যায়, কিংবা রাতে, বললে তুমি তো আসতে পারো একবার। মামাবাড়ী যতবার গেছি, কেউ জানে না সরস্বতী নদী পার হয়ে শ্মশানে গেছি যদি কিছু মেলে, কিছু পাই, এই ভেবে। গোটা

পৃথিবীতে সমস্ত রহস্যগল্পও কেমন যেন ভুল, আমি ভুলের দিকে তাকিয়ে হেঁটেছি আনমনে। মাত্র তোমার জন্যই। তুমি বোঝনি কেন। পরে, অনেকপরে, কতদিন ধরে, গোলাপ মার কোলে শুয়ে শুয়ে মায়ের গল্প শুনেছে অমিতাভ শুধুই গল্প। তখন তাই-ই বড় ভালো লাগতো। তাপস—ওর ভাগ কমে যেতে পারে এমন ভেবে বারবার ডাকতো ওর ঘরে, কিন্তু বাল বন্ধুর ঘরে না গিয়ে গোলাপমার কোলে শুতে অনেক বেশী ভালো লাগতো অমিতাভর।

৬. এর পরে খুব নীরব এবং প্রায় একা হয়ে গেল অমিতাভ। মনে হোল এই যোগসূত্রহীনতাও অনেকটাই ব্যক্তিগত মাশুলে পা পেতে দিয়েছে। কলকাতায় চলে এলো পড়তে। পরে বোঝা গেল, না পড়তে নয় অন্য কিছু করতে। একটা যৌবন দলা পাকিয়ে উঠলো জটিল মানসের তালের ভিতর। ও দেখতে লাগলো—তার মত অনেক ছেলেই ধীরে ধীরে আবার বাড়ী ঘর পড়াশোনা চাকরী প্রেম—ইত্যাদিতে ডুবে গেল। মানে হারিয়ে গেল। অমিতাভ হারিয়ে যেতে গেল হয়তো কিন্তু পারলো না তার চলাহাঁটা ছিল লেখালেখির মহড়ায়। এবার সে ভাবলো—লিখবে কিছু লিখবে। কিন্তু কী লিখবে কেন লিখবে? শুধু মনে হোত অনেক কথা অনেককে বলার আছে, এগুলো জানানোর জন্যই লিখবে। অমিতাভর ভয় হোত ও লিখতে লিখতে যদি সত্যিই লিখিয়ে হয়ে যায়, তাহলে? কলেজে প্রথম বছরেই ওরা ক'জন মিলে একটা কাগজ করলো। শুভর সঙ্গে সেখানেই ওঠালো আলাপ, ঘনিষ্ঠতা। আর আলাপ হোল সুজাতার সঙ্গে। বাড়ী যাদবপুর। বাপের লোহার কারখানা। তারাতলায়। ভাই বোন নেই। মা পুজোর

সময় দ্বিগুণ বেশী। সুজাতা কলেজে আসতো গাড়ী ক'রে। অমিতাভদের সঙ্গে ঘনিষ্টতা হবার পর আর গাড়ীতে নয়, বাসে। এইট বি। সারাদিন জলে ভিজতে ভিজতে রাস্তা দিয়ে হেঁটেছে। দুপুর উৎরে যাবার পর জি. এদের বাড়ীতে গিয়ে খিচুড়ী খেয়েছে। বঙ্গ-সংস্কৃতিতে—একত্রে মহেন্দ্র গুপ্তের 'চন্দ্রগুপ্ত' দেখেছে। আর খুব নীরবে, গোপনে অমিতাভকে ভালোবেসেছে। সুজাতা একদিন বিছানা নিল। ওর রক্তের ভিতর লাল কণিকাগুলো দ্রুত সাদা হয়ে গেছে। ও যেদিন মারা গেল তারিখটা ছিল ৪ঠা এপ্রিল। তার দুদিন আগে অমিতাভকে ও চুমু খেয়েছিল. তখন সুজাতার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। অমিতাভ বোঝেনি মৃত্যু এতো গতিসম্পন্ন। ও লক্ষ্য করছিলো অমিতাভর দেহের চাপ বুকে পড়তেই সুজাতা শিউরে উঠেছে ক'বার। তারপর দুজনেই খুব গম্ভীর লজ্জা পায়। সুজাতা আস্তে আস্তে বলেছিল, 'তুই কিছু বুঝিসনি কেন'। অমিতাভও নীরব ভঙ্গীতে হেসেছিল—'আমি অনেক কিছু বুঝি না'। একবার ওদের কাগজের জন্য পদ্য চাইতে গেল, দুজনে—এক কবির কাছে, কালীঘাট রোড ধরে হাঁটতে থাকে বেণাল ভট্টাচার্য স্ট্রিটে। দু তিন পা হেঁটে অমিতাভ একটা সিগারেট কিনে নারকোল দড়িতে ধরাচ্ছিল, হঠাৎ চুটকো গলি থেকে খালিগায়ের একটি মহিলা অমিতাভর হাত ধরে বলে, 'কি গো—আমার পছন্দ হয়'—অমিতাভ সেদিন নার্ভাস হয়েছিল ভীষণ—কোন রকমে বলেছিল—'আমায় ছেড়ে দিন'। মেয়েটা অন্য দুজনকে এড়িয়ে আলতো শাড়ীটা ওঠালো বুকের ওপর থেকে, গোটা চালকুমড়োর মতো স্তনটা দেখে ফেলে অমিতাভ। এবং ওর গলা শুকিয়ে যায়, ও খুব করুণ তাকায় সুজাতার দিকে। সুজাতা তাড়াতাড়ি মেয়েটির হাত ছাড়িয়ে বলে,

'আমরা একজনের বাড়ী যাবো, আমাদের ছেড়ে দিন দিদি'। মেয়েটা মুখটা কেমন করে যেন স্বাভাবিক করে নেয়, এবং মৃদু হাসতে হাসতে অমিতাভর গালটা টিপে একটু আদর করে নেয়—'কচি পেঁপে আমার'। অমিতাভ কয়েক পা হেঁটেও স্বাভাবিক হয় না, সুজাতা ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বলে—'গাঁইয়া'। কলকাতায় এ ধরণের অভিজ্ঞতা ওর প্রথম। অনেকদিন পর্যন্ত ও সুজাতার কাছে সহজ হতে পারেনি। বরং সুজাতাই ওকে একটু একটু করে সামলে দিয়েছিল। সুজাতা মারা যাওয়ার পর অমিতাভ শুধু পড়াশোনায় মন দেয়। কলেজ পাশ করে বেরুবার মুখেই একটা চাকরী পায়। স্কুলে। স্কুলটা মেয়েদের। কলিগরা প্রায় সবাই মহিলা। ওরি মধ্যে দু'চারজন ছাড়া আর কাউকে ওর পছন্দ হোত না। আজও না। তাদের কর্তৃত্বে ওকে চলাফেরা করতে হয়। এবং দু'চারজন ছাড়া কারও আহাম্মকী কর্তৃত্ব সে বরাবর অপছন্দই করেছে। এরকম 'দিন কাটছে না' গোছের অবস্থায় সে পায় তার বন্ধুদের। সানদা, শুভ, সঞ্জয়, সোমক। একরাম আগে কলকাতায় ছিল, এখন বাড়ী। বীরভূম। বন্ধুদের মধ্যে যারা লিখতো—একরামের লেখা ওর সবচে' প্রিয়। দেখা না হওয়ায় ও হাঁকপাক করে খুঁজতো এ পত্রিকা সে পত্রিকা যদি একরামের লেখা পাওয়া যায়। একরাম এখন লিখছে কম। মাঝে মধ্যেই গ্রামের বন্ধু রবির মুখটা খুব ভাসে। রবি ওর সবসময়ের বন্ধু। খুব ছোট থেকেই। এরকমই একটা অবস্থায় অমিতাভর মেজো বোন কলকাতায় চলে আসে পড়তে। বড় বোন বিয়ে করবো না করবো না করতে করতে চলে যায় বাঁকুড়ায়। একটা আদিবাসীদের স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। ছোটবোন বাবা মার কাছেই থাকে। পড়ে-টুয়েলভে। এরা তিনজনই অমিতাভর খুব প্রিয়।

দাদার নামে কেউ কিছু বললে তাদের কোন ক্ষমা নেই, তা অমিতাভ জানে। এ তিনটে বোনকে খুব সুখী করতে মন চায় অমিতাভর। খুব অসচ্ছল অবস্থার মধ্য থেকেও তার অক্ষমতা মাঝে মধ্যে ঢাকের মতন বেজে ওঠে। ওদের হাতে কিছু তুলে দিতে পারলে অমিতাভর ভিতর একটা খুশীরক্ত বইতে আরম্ভ করে, বেহলার মতো, মৃদু। সম্পর্ক চ্যুত হয়ে যায় প্রায়ই অমিতাভ। কি করে যে, কি করে যে। যুবক ছেলেদের এটা হয়। প্রায়ই ভাবনা ধরে—আমি কেন কিছু বহন করবো! আবার ঠিক পরেই হয়তো মনে হয়—শুধু সংসার কেন—গোটা পৃথিবীর বহনক্ষমতাই তার আছে। উহ্ লোকজন এটা কি করে বুঝবে। কী করে?

·

৭. কলেজস্ট্রিটের ওপরেই দেখা হোল অয়নের সঙ্গে, সঙ্গে ওঁর সেই কলিগ। ইনকাম ট্যাক্স। বিবাহিতা। একটি মেয়ে। স্বামী একটি ব্যাংকে আছেন। নর্থ কলকাতায় একটা ফ্ল্যাটে থাকেন। অয়নকে প্রায়ই এই মহিলার সঙ্গে দেখা যায়। অয়ন অমিতাভর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। শীতুদি। লম্বা। কালো। কোন সাজ গোজের ব্যাপার নেই। অয়নের কলেজেই পড়তেন। বছর তিনেকের সিনিয়র। একটু লম্বাটে মুখ, নাকের পাশে তীক্ষ্ণ ভাঁজ। চোখ দুটো ছোট, চিবুকে গোল ছোট্ট বাটী উপুড় করা, ঠিক মাঝখানে একটা ভাঙা চিহ্ন। চুলে ফিক্সনী পড়ে না। বেশ অহংকারী। সোজা হয়ে হাঁটেন। ঠোঁটের দিকে তাকালেই মনে হয় এইমাত্র গোটা কুড়ি চুম খেয়েছেন। উনি একদিন অয়নকে বলেছিলেন, অফিসে কেউ কেউ একটু অন্য ব্যবহার করছে। অয়নের বুকে গুড়গুড় শব্দ হয়েছিল, 'অন্যরকম মানে'—'মানে

আর কি, একটু অন'রকম'—'কে'—উনী অন্যদিকে তাকিয়ে বলেছিলেন 'নিজেকে জিজ্ঞেস কর'। অয়ন ধরা পড়ে যাওয়ায় খুব লজ্জা পায়, এবং স্বাভাবিক হয়ে যায়। অমিতাভকে অয়ন জিজ্ঞেস করেছিল, 'তবু জানিস অমিত—সবসময় অয়নকে চাই, অয়ন নইলে আবার চলবেওনা, অথচ—বুঝি না মাইরী, অমিতাভ কিছুক্ষণ অয়নের দিকে চুপাতা মেলে বলেছিল, 'তুই ভালবাসিস'। 'হ্যাঁ'। 'তপুর কি হবে'। 'তপুকে বিয়ে করবো, আলবৎ, কিন্তু ওকেও যে ভা'লবাসি',—'কিন্তু বয়স'—'ধুস্ শালা ভালবাসায় গুরু বয়স আসছে কোত্থেকে, ওটা তো ওস্তাদ ডিক্স-নারীর সম্পত্তি। এ্যাতো মনে পড়ে শীতুদিকে, মনে হয় শালা তিন বছর ধরে, বুকে মুখ রেখে পড়ে থাকি চুপচাপ। তুই বুঝবি না গুরু কি শান্তি,—আসলে অন্দরমে যো যো খুপরী রহতা হ্যায় না—এক খুপরি শালা হোল লাইফকে লিয়ে তপুকো, আউর উসী তরফ আর একঠো শীতুদিকো। এর বেশী তো কোনদিন কিছু চাই না, কিচ্ছু না—কি করবো বল ভালবাসি যে ওস্তাদ, কেন জিজ্ঞেস করিস না'! অয়নকে কিছু বোঝায় না অমিতাভ। শুধু বোঝে ছেলেটার অন্য কোন ধান্দা নেই, শাতুদির একটা নীলছায়ায় অয়ন নিজেকে খুব পরিষ্কার রাখে, গন্ধহীন। না হলে তপুকে এমন পাগোলের মত ভালবাসতই বা কী করে। একবেলা না দেখলেই তো ওর বুকে যন্ত্রনা শুরু হয়। অমিতাভকে দেখেই শাতুদি দাঁড়ান। হাসেন। এইবার অমিতাভরও মনে হয়—অয়ন ঠিক বলে—ঠোঁটদুটো ডাকছে। —'বলুন কী খবর'। 'কেমন আছো, বহুদিন পর দেখা'। অমিতাভ এর কোন জবাব দেয় না। হাসে। 'আপনারা চাকরী বাকরী করেন না?' —'করি—তবে তোমার মত সবসময় নয়' একটুখানি ফাঁক না বার করতে পারলে তো

হওয়া হয়ে যাবো'। অমিতাভ একটু সাহসী ভঙ্গীতে বলে—'অরুন কেমন আছে, ওর পাগলামি'? 'বন্ধুকেই জিজ্ঞেস কর'। সম্ভবতঃ আলগা কথা বাঁচাবার জন্য তৃপা এগিয়ে আসেন—'জানি, ও পাগোল একটা',—তারপর মুখ নীচু করে একটু স্তব্ধ হয়ে মাটিতে পা ঘসতে ঘসতে বললেন,—'চলি পরে দেখা হবে'। অরুনরা চলে যেতে অমিতাভ একটু এগিয়ে যায় বৌবাজারের দিকে। মোড়ে ওর নিজের স্কুলের এ্যাসিস্টেন্ট হেডমিস্ট্রেসকে দেখতে পায়, দুপুর তিনটে, টিউশনী চললেন। অবিবাহিতা বোনের কাছে থাকেন, প্রচণ্ড দাপটে, খুব সরল, হাসলেই তা বোঝা যায়, অত্যন্ত সৎ, ভদ্রমহিলার মাধারিটি সেন্ট পার্সেন্ট। বিয়ে হওয়া উচিত ছিল। ছেলেপিলে না হলে এঁদের মানায় না। প্রেম করেছিলেন কি না—তা মাঝে মাঝে ভাবে। একদিন সারাদিনের এক মজার টুরের মধ্যিখানে প্রায় জিজ্ঞেস করতে পারে, এমনি সময় উনী বলে উঠলেন, 'চল ইলিশমাছ আর ভাত পাওয়া যায় এখানে'। অমিতাভ বলতে গিয়েও আটকে নেয় নিজেকে। এঁর সঙ্গে স্কুলের আর একজনের এক জায়গায় মিল আছে। বাণীদি। একবার ইলেকট্রিক শক্ লাগে অমিতাভর। কপালে মাথায় যেভাবে হাত বোলাচ্ছিলেন বাণীদি, তাতে কৃতজ্ঞতায় চোখে জল এসে গিয়েছিলো—। চোখ খুলতে স্বভাবতই দেরী হয়েছিল খানিক। একসময় সেই ভদ্রমহিলা বাসে উঠে যান। একটা সিগারেট ধরিয়ে অমিতাভ এগিয়ে যায় আর একটু, ওয়েলিংটন, একটা কাগজের অফিসে। টুকটাক কয়েকটা কাজ সেরে ও চারটের সময় তৃপার সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে চলে আসে, উল্টোদিকে। মাণিকতলা। যথারীতি মিনিট কুড়ি লেট করে এল। অসুখের পর একটু মোটা হয়েছে। ভালই লাগে। আর একটু উজ্জল মনে হয়।

কপালে একটা ছোট সিঁদুরের টিপ। চোখে কাঁকা আকাশ। চাউস। তাঁতের বুটি দেয়া একটা হালকা নীল শাড়ী। সাদা ব্লাউজ, হাতে একটা ব্যাগ, ছোট্ট। একগাল হেসে বললো—'আমার খুব দেরী হয়নি কিন্তু, কিছু বলবে না'। ব্যস্ সব মাফ। সাত খুন। তৃণা জানে। অমিতাভও জানে। তৃণাকে কীভাবে বাড়ী থেকে বেরুতে হয় —তা জানে অমিতাভ। এই রকম একটা মেয়েকে শুধু সম্পর্কের দেয়াল তুলে বাবা—মা-কাকারা বিপরীতে তৃণার দাদারা যা—ছিঁড়ে ফেলতে চায়। গত নভেম্বরে তৃণার বাবা মারা গেছে, তবু মাস তিনেক পরেই বিয়ের জন্য বাড়ী থেকে চাপ দিতে থাকে। তৃণা ওগুলো খুব কৌশলে এড়িয়ে চলে। অমিতাভ পারলে আজই তৃণাকে নিয়ে আসে। তৃণা সময় চায় —কয়েক মাস। অমিতাভ বোঝে না কেন? তৃণা বলে, 'তুমি তো মানো না, চাও-ও না, তবু বাবার মৃত্যুর একটা বছর না গেলে, —আমার মন সায় দেয় না গো'। এই জায়গাটা নিয়ে অমিতাভ কোন বিতর্কে যাবে না। তাই হোক। এসব কথা উঠলেই অমিতাভ একটু বেশী চুপচাপ থাকে তৃণা আবহাওয়া সহজ করার ভঙ্গীতে বলে—'কিগো রাগ করলে'। অমিতাভ হাসে। না। রাগ করেনি সে। করবে না। তৃণা যদি অন্যত্র বিয়েও করতে চায় অমিতাভ বাধা দেবে না। কোন-দিনই না। তৃণা যদি সেই ঠিক করা পাত্রটিকেও বিয়ে করতে চায় —অমিতাভ তবুও বাধা দেবে না। কখনও। তৃণা যখন তার জীবনে চিরদিনের মতো আসবে, তখন অমিতাভ চাইবে, আজ নয়। মাঝে মাঝে অমিতাভর মনে হয়—বাড়ীটা তো এত্তো প্রগ্রেসিভ, গাঁয়ের ভিতর যখন কেউ ভাবতেও পারতো না সেই সময় জেঠুবাবু জেঠাইমাকে বিয়ে করেছেন ভালোবেসে ন-কাকা, চাকরী না করা অবস্থাতেও নমাকে

এনেছে, কিছু জটলা তো হয়েছেই, হতেই পারে। তবু সেই লোকগুলো আজ এমন বিপক্ষে কেন—কি জন্য! শুধুই সম্পর্কের জন্য? আশ্চর্য্য! আজ এই সময় কি এগুলো প্রশ্ন? অমিতাভর মনের ভিতর বিশ্বাসের অবিশ্বাসের ফুলগুলো ফুটতে থাকে যথাযথ। তৃণা কষ্ট পাবে এমন কোন পৃথিবী অমিতাভ মেনে নেবে না। কোনদিনই না। তৃণা ওকে ধাক্কা দেয়,—'এ্যাই কি ভাবছো আবোল তাবোল'? অমিতাভ হাসে। জবাব দেয় না। '—কোথায় যাবে'? —'জানি না, চল ঐ বাসটায় উঠি,—এস টিকটিন'। 'ওটাতো এয়ারপোর্ট যায়'। 'জানি'। হঠাৎ আবিষ্কারের ভঙ্গীতে তৃণা বলে— 'ও বুঝেছি গোপাদির বাড়ী'। অমিতাভ হাসে। 'লক্ষীমেয়ে, আমার মুটুভাই'। বাসের ভিতরেই একটু থুতনি নেড়ে দেয়। তৃণা চোখ পাকাতে পাকাতেই হু একজন ভদ্রজন গলায় কৃত্রিম শব্দ করে ওঠে, যেন—বাসে নো স্মোকিং-এর মতো কোথাও লেখা আছে লালকালিতে "ছোঁবে না,—ডোন্ট টাচ'। অমিতাভ ঠোঁট উল্‌টে দিল। বয়ে গেছে।

৮. সেদিন গোপাদির বাড়ী থেকে ফেরার সময় একটু ভিজেছিল অমিতাভ। তারপর জ্বর। আর জ্বর হলেই থার্মোমিটারের পারার মাপে তা চলে না। ঘরে অচেতন প্রায়। এর ভিতরেই ওর স্পষ্ট মনে পড়ে সেই ফুড পয়জনের কথা। হু হু পায়খানা আর বমি। সবারে ছুদিন। রমেনদা তখন অফিস! গোপাদি একা থর থর কাঁপছে, কোন রকমে একটু হোমিওপ্যাথি করেই ঠাকুরের কাছে বসে পড়লো ধপাস করে। যেন গোপাদির ঠাকুরের পাড়া থেকে কোন একজন বেরিয়ে এসেই অমিতাভকে ভাল করে দেবে। তারপর সিগারেটে আগুন ধরিয়ে

খুব স্মার্ট ভঙ্গীতে বলবে, 'চলি ভাই'। ডাক্তার এলো, এ্যালোপ্যাথি। গোপাদি সমানে সেবা করে যাচ্ছে আর অমিতাভ ধীরে ধীরে খারাপের পথে এগুচ্ছে। রমেনদা অফিস থেকে ফেরায় পায়ের নীচে মাটি পায় গোপাদি। অমিতাভ অল্প অসুস্থতার মধ্যেই আলমারি খুলে দিদিভাইয়ের বেষ্ট শাড়ীটা পরলো, তারপর শুয়ে পড়লো। এবং শুয়ে পড়েই বুঝলো অন্ততঃ দুটোদিন! ফিনকি দিয়ে বমি আর পায়খানার মধ্য ছিল প্রলাপ আর ঢাউস জ্বর। সোনায় সোহাগা। সেদিন রাত্রের দিকে চোখ বুজতেই পারছিলো না, দিদিভাই মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, আর চমকে চমকে ঘোরের ভিতর গোপাদির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছিল দিদির মুখটা হঠাৎ হঠাৎ পালটে যাচ্ছে, দ্রুত বসে যাচ্ছে ঠিক ঐখানে অন্য একটা শান্ত গ্রাম্য বধূর মুখ, অমিতাভর মায়ের। আর সেই অসুখ থেকে উঠেই অমিতাভ বুঝতে পারলো গোপাদিও দিদি থেকে কেমন করে যেন অন্য একটা সিঁড়িতে পৌঁছে গেছে। আপনা আপনি। অমিতাভ আজও দুপুরে চোখ বুজে ভাবছিলো এই সব। এমন সময় হঠাৎ, ভীষণ হঠাৎ তৃণা এলো। ভাবতে ভালো লাগলেও বিশ্বাসে কুলোচ্ছিলনা। 'একিগো, জ্বর করেছো, আমি ঠিক জানি, পরে বৃষ্টি হতেই ভেবেছি ভিজেছো'। ও প্রায় বাচ্চা ছেলের মত তৃণাকে জড়িয়ে ধরলো, আষ্টেপৃষ্ঠে। ওর কোলে শুয়ে রইলো অমিতাভ। তৃণা খুব ঘনিষ্টভাবে হাত বোলাতে লাগলো অমিতাভর মাথায়। অমিতাভ ঐ সময় ছোট্ট শিশু হয়ে গেল। বালতিতে মাথা ধোয়ালো, গা মোছাল, তারপর একটা জামা পরিয়ে অমিতাভকে বুকের ওপর চেপে ধরলো, যেন এক্ষুনি তৃণার স্তন থেকে নেমে আসবে দুগ্ধধারা, অমিতাভর ঠোঁট কি ভিজে যাবে, যেতে পারে। ঠোঁটের রং কি এখন সাদা, হতে পারে। তৃণার বুকের ঠিক মধ্যিখানে কি

অমিতাভর জিভ আটকে যাবে, যেতে পারে। তৃণার ঠোঁটটি এখন অমিতাভর চোখের ওপর। হ্যাঁ, তাই। হাত দুটো অমিতাভর শরীরের দুই প্রান্ত বেয়ে শিকড়ের মতো ছড়িয়ে, বুকে। অমিতাভ খুব আধো আধো স্বপ্নের মতো তৃণার কানে কানে বলতে লাগলো 'জানো তৃণা গাঁয়ে, যখন খুব ছোটবেলায় জ্বর হ'ত ভীষণ, তখন আমার কচি শশা খেতে ইচ্ছে হোত, আজও হচ্ছে।' তৃণার গালে গাল চেপে বললো— 'বেশ, তাই কিনে দোব, লক্ষ্মীছেলে, ভালো হয়ে ওঠো'। এ কে কথা বলছে। কে। তৃণা! অমিতাভ আচ্ছন্ন হবার আগে দেখলো, হ্যাঁ তৃণা। সাক্ষাৎকারের। অমিতাভর চোখে কি জলের ধারা না এল। কে রুখবে, সাধ্যি কার! আশপাশে কি ঠাম্মা দেখতে পাচ্ছে, গোপাদি কি দেখছে, মা, সেই ন-কাকার 'মেয়ে বন্ধু' তুমি, তুমি কি আশপাশে আছো কোথাও। প্রলাপ কি নৌকর মতো ভেসে যায়। অমিতাভ একটু সজাগ হয়। তারপর খুব সতর্ক হয়ে বলে, 'তৃণা, তুমি আমার কাছে থাকো'। তৃণা অমিতাভকে বুকের মধ্যিখানে আর একটু টেনে নেয়। গাঁয়ের বাড়ী থেকে প্রায়ই ও দখিনমাঠে যেতো বিকেলে, আল ধরে, শ্মশানের পাশ দিয়ে, বাঁদিকে মাটির পাহাড় ফেলে জাঙাল পার হোত, তারপর ইলেকট্রিক পোস্টের সাঁ। সাঁ শব্দের ভিতর পার হোত আর একটা ছোট মাঠ, পার হয়ে চলে যেতো অহল্যাবাই রোড গরুমরা পোলের ধারে। রেলিং-এর ওপর বসে পা ঝুলিয়ে আখ খেতে খেতে দেখতো একটা একটা করে বাস চলে যেতো এদিকে ওদিকে। জানলার ধারে যাত্রীরা অবধারিত দৃষ্টি ফেলতো অমিতাভর দিকে। ইচ্ছে হ'লে অমিতাভ তাদের খুশী করার জন্য মৃদু হাত নাড়াতো। উত্তরে ওরাও কেউ কেউ। দোবখাওয়া পায়ের দুটো পাতার তলায়

হাত খানেক ব্রিজের সিমেন্ট পার হয়ে হুস্ স্ করে বাস রাস্তাটা দুই শিরাখালা চলে গেছে, তারপর গঙ্গা, তারপর চাপাডাঙ্গা, তারপর এই রকম কোথায় যে চলে গেছে। তৃণা কি ওর হাত ধরে ঐদিকে এর শ্মশানের পাশ দিয়ে, জাঙাল টপকে দাখনের ছোটমাঠ পেরিয়ে গরুমরা পোলের দিকে নিয়ে যাচ্ছে! এখান দিয়ে এতোদিনের জংধরা বোস-পুরনো বাসগুলো এপাশ ওপাশ চলে যাবে, এ বাসে কি অমিতাভর বন্ধুরা যাবে, অমিতাভ তৃণার হাতটা খুব শক্ত করে ধরে খুব কষ্ট করে বললো, 'কলকাতা ভাল্লাগেনা, বাড়ী চল, ওখানে থাকবো'। সেই মুহূর্তে হুস্ হাস্ দুটো বাস চলে গেলো, ঐ বাসে কারা আছে? রবি, অশোক, তাপু, গোড়া, ক্যাপ্টেন তুমি আছো? সানদা, একরাম, সোমক, শুভেন্দু, গোপালদা, শীতুদি, তুমি? কে আছো তোমরা, কে? তৃণা কানে কানে বলে 'আমি আছি, আমি আছি শোন—এ বাসে তোমার সঙ্গে আমি আছি'। অমিতাভ গোঙাতে গোঙাতে বলে 'কোথায় যাচ্ছে বাস' 'তোমার গাঁয়ে, মায়ের বাড়ী'। অমিতাভ অনুমান করে আর তিন চার মিনিট পরেই দাশপুকুরের পাড় দিয়ে ওরা সদর ঘরকে বাঁয়ে রেখে বাইরের দরজায় টোকা মারবে। কাকীমা বুম্বিকে কোলে নিয়ে দৌড়ে আসবে, পিছনে পিছনে কোমর বেঁকিয়ে চশমা পরা ঠাম্মা। আর তৃণা একটু হেসে হেঁট হয়ে ওদের প্রণাম করে উঠলেই অমিতাভ বলবে 'বলতো মা, এ কে' —নতুন কাকীমা মুখ টিপে হেসে ফেলবে নিশ্চয়ই। তারপর চিবুকে ডান হাতের আঙুল টুক করে তুলে নেবে, একটা চুম, তৃণার। ঠাম্মা- তৃণাকে বুকে টেনে উঠবে বড়ঘরের দোরে, তারপর দরজা খুলে অমিতাভর মায়ের ছবির কাছে নিয়ে যাবে, তৃণা—খুব নীরবে প্রণাম করবে—শান্ত। অমিতাভ হয়তো জামা খোলার পর আবেগে গেঞ্জীটা তাড়াতাড়ি খুলতে গিয়েই একটু ছিঁড়ে ফেলবে! কেউ বকবে না। আর অমিতাভও কোন শব্দ করবেনা। এমন কি তৃণার চোখ লক্ষ্য করে কোন হাসিও হাসবে না। শুধুই দেখতে থাকবে। চুপচাপ। সবাইকেই। একটু একটু।